# তৃতীয় অধ্যায়ঃ

প্রমথনাথ বিশীর উপন্যাসের বিষয়বস্তু ঃ

- ‘ দেশের শত্রু’
- ‘ কোপবতী ’
- ‘ পদ্মা ’
- ‘ জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার ’
- ‘ চলনবিল ’
- ‘ অশ্বত্থের অভিশাপ ’
- ‘ কেরী সাহেবের মুন্সী ’
- ‘ লালকেল্লা ’
- ‘ বঙ্গভঙ্গ ’
- ‘ পনেরোই আগষ্ট ’

# তৃতীয় অধ্যায়

## প্রমথনাথ বিশীর উপন্যাসের বিষয়বস্তু

প্রমথনাথ বিশীর প্রাক্ স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা উত্তর উপন্যাসের বিষয়বস্তু নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ

### 'দেশের শত্রু' – (১৯২৫)

'দেশের শত্রু' উপন্যাসের বিষয়বস্তু স্বদেশী আন্দোলন থেকে অসহযোগ আন্দোলন পর্যন্ত বুদ্ধিজীবি বাঙালী মানসের স্বদেশ চেতনার নানাবিধ পদক্ষেপ, তাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব, সঙ্কীর্ণ দেশপ্রেম, ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ, পরাধীনতা থেকে মুক্তির সংগ্রাম ও ভারত আত্মার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের এক ব্যর্থ প্রচেষ্টা যেখানে কোন মতবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশকে ইংরেজ শাসিত ভারতে যখন ইংরেজদের অপশাসনে ভারতবাসীর মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছিল তারই ফলশ্রুতি হিসেবে স্বদেশী আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলন বঙ্গদেশ তথা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। একদিকে যন্ত্র সভ্যতার বিকাশের ফলে কৃষিনির্ভর বঙ্গদেশের কৃষকদের একাংশ শিল্পকারখানায় এসে শ্রমিক জীবন শুরু করে, অন্যদিকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কুফল ব্যাপকতা দান করেছিল। সেই সঙ্গে বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে স্বদেশী যুগের এক চাঞ্চল্যকর সময় যখন অসহযোগ ও স্বাধীনতা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বিদ্রোহ দানা বেঁধেছিল সেই সময়কালের রচনা আলোচ্য উপন্যাসটি।

উপন্যাসটির ভৌগোলিক পটভূমি যদিও সমগ্র বঙ্গদেশের হয়ে ওঠে নি, এর পটভূমি

কলকাতা ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চল হাওড়া, কলেজষ্ট্রীট, শ্যামনগরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

ইতিহাস সচেতক ও সমাজসচেতক শিল্পী প্রমথনাথের রাজনৈতিক ধারণা ছিল স্বতন্ত্র প্রকৃতির। অকারণে তিনি কোন রাজনৈতিক উচ্ছ্বাসকে সমর্থন করেন নি। প্রকৃত স্বদেশ চেতনার নামে স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিদের ভন্ডামীকে তিনি বিদ্রূপ করেছেন। স্বদেশী নেতাদের ও স্বদেশী কবিদের প্রতি তাঁর ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী আলোচ্য উপন্যাসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

প্রমথনাথের প্রথম উপন্যাসটির বিষয়বস্তু তৎকালীন রাজনৈতিক পটভূমিকায় হলেও শিল্পরূপে সার্থক হয়ে ওঠে নি। যদিও লেখক এটিকে উপন্যাস হিসেবে স্বীকার করেননি। তবুও প্রমথনাথের উন্মেষপর্বের উপন্যাসটি আলোচনার অপেক্ষা রাখে। বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে বাংলা কথাসাহিত্যের বিস্তারে উপন্যাসটির একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে।

স্বদেশী আন্দোলন জাতীয় জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। বিদেশী দ্রব্য বর্জন, স্বদেশী দ্রব্যের ব্যবহার, বয়কট, সত্যাগ্রহীদের গ্রেপ্তারবরণ, নারী স্বাধীনতা, জাতীয় শিক্ষার প্রসার ইত্যাদি গণ আন্দোলনের নানাবিধ কার্যকলাপ উপন্যাসের বিষয়। স্বদেশী শিল্পের প্রসারের জন্য চড়কা ও তাঁতের ব্যবহার, সরকারী অফিস, স্কুল কলেজ বয়কট, ইংরেজী শিক্ষার বিরোধিতা ইত্যাদি দেশাত্মবোধক এক চাঞ্চল্যকর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল এ ব্যাপারে শিল্পীমন নির্লিপ্ত থাকে নি।

উপন্যাসের চরিত্রগুলো প্রত্যেকেই মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত ও নিম্নশ্রেণীর প্রতিনিধি। সুরদাসবাবু মধ্যবিত্ত শ্রেণীভূক্ত একটি বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর কর্মস্থল। ব্যক্তিত্বে, পান্ডিত্যে প্রভাব প্রতিপত্তিতে উল্লেখযোগ্য চরিত্র। স্বদেশী হলেও তিনি পাশ্চাত্ত্য শিক্ষানুরাগী। তিনি বিশেষভাবে

জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন। হৃদয়বাবুর ৫০ টাকা বেতনে পাটের হিসাবরক্ষকের কাজ ছেড়ে স্বরাজ লাভের জন্য দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করে এখন তার জন্য মাসিক ২০০ টাকা বরাদ্দ এবং তার পত্নী ও নাবালক পুত্র যথাক্রমে ১০০ টাকা ও শিক্ষানবিশির জন্য প্রাপ্য নির্ধারিত অর্থ। নীপেনবাবু ওকালতিতে প্রতিষ্ঠা না পেয়ে দেশের কাজে অংশগ্রহণ করে। পিনাকবাবু সংস্কৃতে এম.এ. পাশ করে সরকারীবৃত্তি পাওয়া সত্ত্বেও আত্মোন্নতির পথ বেছে নেয়নি, সে সীতার রূপমুগ্ধ। ব্রতেন্দ্রবাবু কবি ও সাহিত্যিক, সাহিত্যের বিকাশ যার লক্ষ্য। জগত্তারণ বাবু আধ্যাত্মিক উন্নতিতে দেশোদ্ধারের কথা ভাবেন। গদাধরবাবু জাতীয় শিক্ষানীতির বিশ্বাসী। সুকেশিনী ও সুলেখা নারী চরিত্রের প্রতিনিধি নারী স্বাধীনতা ও নারী জাগরণ যাদের লক্ষ্য। 'যুগবাণী' পত্রিকায় জ্বালাময়ী ভাষণ যার অন্যতম লক্ষ্য। নৃত্যগোপালবাবুর প্রকাশ নাচের ভক্ত হিসেবে। এছাড়া নিম্নশ্রেণীর চরিত্রের মধ্যে রমজান খলিফা, সহিস ও কোচোয়ান উল্লেখযোগ্য। প্রমথনাথ যে চরিত্রগুলো উপস্থাপন করেছেন তারা বাস্তবতার মাটি থেকে উঠে আসা চরিত্র।

'দেশের শত্রু' উপন্যাসের ঘটনার বিস্তৃতি নেই। বিভিন্ন চরিত্রের তর্ক বিতর্ক এখানকার মূল বিষয় হলেও সত্যাগ্রহীদের শ্যামনগরের শিবমন্দিরের অর্থের প্রলোভনে কারাবরণ, সুরদাসবাবু ও হৃদয়বাবুর ইংরেজী শিক্ষার পক্ষে বিপক্ষে জনসমর্থন আদায়ের ক্ষেত্রে অর্থ দিয়ে হৃদয়বাবুর সমর্থন আদায় উপন্যাসের মূল ঘটনা।

যুগবাণী পত্রিকায় হৃদয়বাবু তার জয় প্রকাশ করে ও সুরদাসবাবু প্রতি বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করলে শোকাহত সুরদাসবাবু জানায় তার সব সুখ সব আশা নিভে গেছে।

প্রমথনাথ উপন্যাসে পিনাকবাবুর সঙ্গে সীতার প্রেমের চিত্র অঙ্কন করেছেন। প্রেম মনস্তত্ত্বের দিকটি নিসর্গ চেতনার আলোকে কবিত্বপূর্ণ ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন ঔপন্যাসিক।

লেখক উপন্যাসে যেমন যৌন চেতনার উল্লেখ করেছেন তেমনি তাদের বিরহ বেদনা দিয়ে কাহিনীর সমাপ্তি টেনেছেন।

ঔপন্যাসিক উপন্যাসের ফাঁকে ফাঁকে বিভিন্ন চরিত্রের দৈহিক বর্ণনা দিয়েছেন অনবদ্যভাবে।

বিভিন্ন চরিত্রের উপস্থাপনায় কথাশিল্পী তৎকালীন বঙ্গদেশের রাজনৈতিক অবস্থার বাস্তব বর্ণনা দিয়েছেন। সাহিত্য, সঙ্গীত, আধ্যাত্মিক, ইতিহাস, অর্থনীতি ও স্বদেশচেতনার বিভিন্ন দিক আলোকপাত করেছেন আলোচ্য উপন্যাসে।

লেখক উপন্যাসে তৎকালীন স্বদেশী নেতাদের মধ্যে ব্যক্তিগত প্রভাব বাড়াবার জন্য অন্তর্দ্বন্দ্বের দিক যেমন ফুটিয়ে তুলেছেন তেমনি অর্থের বিনিময়ে জনসমর্থনের বাস্তব চিত্রটি উদ্‌ঘাটন করেছেন। আবার স্বরাজ ফান্ড গঠন করে অর্থ সংগ্রহ করে ব্যক্তিস্বার্থে কাজে লাগাবার বাস্তব ঘটনা বর্ণনা করেছেন। আসলে স্বদেশপ্রেম বলতে যা বোঝায় প্রমথনাথ তৎকালীন নেতাদের মধ্যে যে কপট স্বদেশপ্রেম দেখেছেন তার যথাযথ বিবরণ দিয়েছেন আলোচ্য উপন্যাসে।

## 'পদ্মা' – (১৯৪৩)

কথাশিল্পী পটের উপর নির্ভর করে কাহিনী ও চরিত্র রূপায়িত করেন। নদীমাতৃক উত্তরবঙ্গের রাজসাহী জেলার বুক চিরে প্রবাহিত পদ্মানদীর তীরবর্তী চরচিলমারী অঞ্চলের

স্থানিক বৈচিত্র্যের পটভূমিকায় 'পদ্মা' (১৯৪৩) উপন্যাসটি রচিত। এই পটভূমিতে সচেতনভাবে সৌন্দর্যানুভূতি ও নিসর্গপ্রীতি যুক্ত হয়ে উপন্যাসটিতে জীবনরস সৃষ্টি করেছে। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমথনাথের উপন্যাস আলোচনায় বলেছেন—

" লেখকের নিসর্গানুভূতি সাধারণরূপে তীক্ষ্ণ ও গভীর, তাঁহার উপন্যাসের প্রায় প্রত্যেক পৃষ্ঠায় প্রকৃতিচিত্রের অম্লান সৌন্দর্য ঝলমল করিতেছে।" [১]

উপন্যাসটির ভৌগোলিক পটভূমি মুখ্যতঃ রাজসাহী অঞ্চলের। তবে রাজসাহীর ভৌগোলিক সীমা ছাড়িয়ে প্রমথনাথ মাঝে মাঝে কলকাতা, দার্জিলিং, মুর্শিদাবাদের কার্ত্তিকপুরের কাহিনী উপস্থাপিত করেছেন উপন্যাসের ঘটনা বিস্তারের প্রয়োজনেই।

হিন্দু মুসলমান অধ্যুষিত চরচিলমারীর হিন্দু কৃষক পরিবারের কন্যা কঙ্কণ উপন্যাসের নায়িকা। রাজসাহীর এক মধ্যবিত্ত পরিবারের যুবক বিনয়ের সঙ্গে কঙ্কণের পরিচয় ঘটে আকস্মিকভাবে। প্রকৃতিপ্রেমিক বিনয় কলকাতার এক কলেজের ছাত্র, ছুটিতে অবসর বিনোদনের জন্য বন্ধুদের নিয়ে পদ্মা ভ্রমণ ও বনভোজনের প্রস্তুতির সূত্র ধরেই কঙ্কণের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে। ধীরে ধীরে পারিবারিক পরিবেশে তাদের চিত্তলোকে আশা আকাঙ্ক্ষা, দ্বন্দ্ব সংঘাত, অনিকেত ও শরীরী প্রেম মূর্ত হয়ে উঠল কিভাবে, চরিত্রের মনোলোকের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে তাদের আত্ম আবিষ্কারের স্বরূপটি উদ্‌ঘাটন করেছেন শিল্পী প্রমথনাথ।

উপন্যাসটি তিনটি পরিবারকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীভূক্ত দুটো পরিবার বিনয় ও অবিনাশবাবুর পরিবার এবং দরিদ্র কৃষক পরিবারে জীবনচিত্র সামাজিক পটভূমিকায় রচিত হয়েছে। আলোচ্য উপন্যাসে একদিকে রাজসাহী কেন্দ্রিক পল্লী জীবন অন্যদিকে কলকাতাকেন্দ্রিক নাগরিক জীবন প্রবাহ বাস্তবতার আলোকে রূপায়িত করেছেন কথাশিল্পী।

'পদ্মা' যে সময়কালে রচিত হয়েছে পদ্মালালিত ভূভাগের অন্তর্গত চরের কৃষক পরিবারের জীবনধারা দারিদ্রতা ও সংকটে কান্না হাসির দোলায় সাধারণভাবে আবর্তিত হচ্ছিল। যেখানে নাগরিক জীবনের প্রভাব পড়ে নি পদ্মা প্রকৃতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে সরল অনাড়ম্বর জীবনধারা প্রবাহিত হচ্ছিল। হৃদয়ঘটিত প্রবৃত্তির তাড়নায় কঙ্কণের বিরহী জীবনে জেগেছে এক সুতীব্র জীবন জিজ্ঞাসা — জীবনের মানে খুঁজতে চেয়েছিল সে—

"এই চরচিলমারীতে পদ্মার ধারে, নানা ঋতুর নানা শস্যক্ষেত্রের পাশে জীবনটা কি কাটাইয়া দেওয়া যায় না ? এখানকার নীল নদীর ধারে, সবুজ ক্ষেতের পারে, স্বচ্ছ আকাশের ছায়ায় ? এখানকার আকাশপ্লাবী রৌদ্রে এবং দিগন্তপ্লাবী বর্ষায় ?" [২]

কঙ্কণের অসামাজিক মাতৃত্ব তার জীবনের প্রতিকূলতা, পিতার আকস্মিক আত্মহনন, বিনয়ের উদাসীনতা, বনোয়ারীলালের লুব্ধ কামনা কঙ্কণের বিক্ষিপ্ত হৃদয়বৃত্তকে বিধ্বস্ত করেছিল। অসামাজিক মাতৃত্বের সূচনায় তার শারীরিক ও মানসিক উভয় দিক থেকে আলোড়িত করল। একদিকে বসন্তরোগে লুপ্তশ্রী মুখমন্ডল দয়িতের প্রতি সহানুভূতিশীল করে তুলল ঠিকই কিন্তু গ্রামের কুৎসা তাকে প্রতিবাদী করে তোলে নি। সর্বংসহা ধরিত্রী মাতার মতো সে নীরবে ভাগ্যের এই বিড়ম্বনাকে স্বীকার করে নিয়েছে। কঙ্কণ জীবন সংগ্রামে উত্তীর্ণ হয়ে আপন মহিমায় উজ্জ্বল হয়েছে। কঙ্কণ নিজের বেদনাহত নিঃসঙ্গতায় দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে তার চাপা কান্নায় ভেজা চরচিলমারীর প্রকৃতি, পদ্মা তার নীরব সাক্ষী।

বস্তুবিশ্বে গতিশীল সবকিছু। এ গতি জীবনের এ গতি মৃত্যুর । রবীন্দ্রনাথ বলেছেন — "সহস্রধারায় ছোটে দুরন্ত জীবন নির্ঝরিণী মরণেরে বাজায় কিঙ্কিণী।" জীবন ও মৃত্যু প্রতিনিয়ত মানুষকে আকর্ষণ করেছে। কঙ্কণ জেনেছে মৃত্যু কারও ইচ্ছাধীন নয়, সে

আত্মহত্যার পথকে বেছে নেয় নি খুঁজে ফেরে শান্তির পথ।

কার্ত্তিকপুরে পারুলের সঙ্গে বিনয়ের বিবাহের দিনে কঙ্কণের সঙ্গে বিনয়ের সাক্ষাৎ ঘটেছে কিন্তু সেই অতীতের কঙ্কণ নেই। সে মাতৃত্বের স্বাদ পেয়েছে কোলে তার শিশু।

প্রমথনাথ বিশী কঙ্কণের প্রেমের উদ্ভব, বিকাশ এবং পরিণাম ধীরে ধীরে ফুটিয়ে তুলেছেন। কাহিনীতে কোথাও এই প্রেমকে নিন্দনীয় করে তোলেন নি। আবার কঙ্কণকে কলঙ্কিনী বিশেষণেও বিশেষিত করেন নি। কঙ্কণ ও পারুলের প্রেমের একনিষ্ঠ মহিমা ঘোষণা করে তাদের দাম্পত্য জীবনের মর্যাদার আসরে প্রতিষ্ঠাও দেন নি। তিনি ত্যাগের মহিমায় উদ্ভাসিত করেছেন। লেখক বিনয় ও কঙ্কণের প্রেমকে স্বেচ্ছাপীড়নের রিক্ততায় ব্যর্থ করে দিয়ে পূর্ণ মনুষ্যত্বের গৌরবদান করেছেন। উদাসীন পদ্মা এখানে নিয়তির প্রতীক। উপন্যাসের সমাপ্তিতে নায়ক নায়িকার বিচ্ছেদ দেখানো হয়েছে। এক অস্তিত্বের যন্ত্রণায় মুখর উপন্যাসের আদ্যন্ত। কঙ্কণের বিয়োগান্তক পরিণতি গ্রীক নিয়তিবাদকে স্মরণ করায়।

বিনয় পারুল ও কঙ্কণের প্রেম প্রত্যাখানের পর কামনা ও বাস্তবের সংঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে আশ্রয় নিয়েছিল হিমালয়ের পুণ্যতীর্থে। তার জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা নাগরিক জীবনের কৃত্রিম প্রেমের স্বরূপ যখন যে উপলব্ধি করল তখন সে হারাল কঙ্কণকে, না পেল পারুলকে, এক মর্মভেদী যন্ত্রণায় কুঁড়ে কুঁড়ে দগ্ধ করেছিল তাকে। তবে সবকিছু হারিয়ে শিশুপুত্রকে কোলে নিয়ে নিজের অস্তিত্বে পথ খুঁজে পেল।

প্রমথনাথের আলোচ্য উপন্যাসে রোমান্টিকতার সুর দুর্লভ হয়ে ওঠে নি। ত্রিভুজ প্রেমের উপস্থাপনায়, কঙ্কণের সান্নিধ্য লাভের প্রত্যাশায় দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসরে নৌকাযোগে পদ্মাবক্ষে নৈশ অভিযান, হিমালয়ের কোলে শান্তির পথ খুঁজে পাওয়ার বাসনা রোমান্টিক

সুলভ কবিদৃষ্টি।

ঔপন্যাসিক বাস্তবসচেতন। সামাজিক জীবনের আবেষ্টনে পরিবেশ সমস্যা সংকট, জীবন সংগ্রাম, ক্ষোভ, হতাশা, সহজ সরল জীবনের মনস্তাত্ত্বিক রূপরেখা অঙ্কনে প্রমথনাথ বিশী যে একজন সমাজসচেতক শিল্পী তার পরিচয় আমরা খুঁজে পাই। পদ্মাবক্ষে মাছ ধরা, বনোয়ারীলালের পাটোয়ারী বুদ্ধি; পোষ্টমাষ্টার তারণদাসের অতীত মোহ, পদ্মাবক্ষে ঝাপ দিয়ে আত্মহনন, রোগ, শোক, অসহায়তা ব্যক্তিজীবনের মুকুরে সমাজজীবনের মূল্যবোধ যাচাই হয়েছে সন্দেহ নেই। গ্রামীণ সমাজজীবনের উৎসব, পৌষপার্বণ, দোল উৎসবের বর্ণনা, গ্রামজীবনের আনন্দঘন পরিবেশ লৌকিক জীবনকে রমণীয় করে তুলেছে। কঙ্কণের টোপর তৈরী গ্রাম্য কুটির শিল্পের নিদর্শন। এছাড়া গ্রাম্য কুৎসা, দলাদলি, বিচারসভা ইত্যাদি সমাজচেতনার সাক্ষ্য বহন করে। বিনয়ের নাটক, কবিতা প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রকাশকদের মানসিকতা নাগরিক সমাজের পরিচয়বহ। নাট্যচর্চায় অনুরাগী অবিনাশবাবুর পুত্র নিতাই-এর বর্ণনা, অবিনাশবাবু ও স্ত্রী সর্বেশ্বরীর কলহ, সন্তান বাৎসল্য, অবিনাশবাবুর গৃহে আড্ডার আসর বাস্তবসম্মত।

প্রমথনাথের নিসর্গ সৌন্দর্যানুভূতির পরিচয় ঘটেছে বিভিন্ন ঋতুতে পদ্মার বর্ণনায়। পদ্মার গতির সঙ্গে পদ্মা তীরবর্তী চরিত্রের সঙ্গতি লেখক অন্তরঙ্গতার সঙ্গে পরিচয় দিয়েছেন। বর্ষার পদ্মার বর্ণনা দিয়েছেন — "চরচিলমারীর অধিকাংশ ডুবিয়া গিয়াছে, কেবল এক এক স্থানে পুঞ্জিত বসতির ধূসর খড়ের চাল গেরুয়া জলের উপর জাগিয়া আছে। চরের দক্ষিণ ধার দিয়া পদ্মার বৃহত্তর শাখাটা প্রবল ভাঙন লাগিয়াছে।"[৩]

প্রমথনাথ পদ্মা উপন্যাসে অতিপ্রাকৃতের আমদানি করেছেন যা উপন্যাস

শিল্পের রসহানি ঘটায় নি।

উপন্যাসের চরিত্রগুলো লেখকের বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রসূত। বিনয়ের সঙ্গে লেখকের পরিচয় ঘটেছে বহুবার। চরচিলমারীর কঙ্কণ, ডাকাবুকো, বনোয়ারীলাল, অবিনাশবাবু, বাদল, নিতাই, ভাগচাষী করিম, পারুল, পরমেশ, রূপেন, সর্বেশ্বরী প্রভৃতি চরিত্র বাস্তব জগতের সৃষ্টি। তাদের মুখের ভাষা প্রমথনাথ বাস্তবসম্মতভাবে প্রকাশ করে জীবনরসের সংযোজন ঘটাতে পেরেছেন। কেন্দ্রীয় চরিত্র বিনয়ের জীবনব্যাখ্যায় লেখকের ধারণা ব্যক্ত হয়েছে। কথাশিল্পী চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ফাঁকে ফাঁকে বিভিন্ন চরিত্রের দৈহিক রূপের বর্ণনা দিয়েছেন সার্থকভাবে।

উপন্যাসের বিষয়বস্তুতে লেখক বাৎসল্যরস, শান্তরস, করুণরস ও নির্মল হাস্যরস বা হিউমার এর অবতারণা করে উপন্যাসটিকে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন।

কথাশিল্পী আলোচ্য উপন্যাসে দেখাতে চেয়েছেন প্রাক্‌বিবাহিত প্রেমের অসংযত প্রবৃত্তি জীবনকে কেমন করে যন্ত্রণার সৃষ্টি করে এবং পরিণামে তা সুখদায়ক না হয়ে বিয়োগান্তক পরিণতি বহন করে আনে তারই এক অনবদ্য ঘটনা।

প্রমথনাথের এই উপন্যাসের নায়ক নায়িকারা অভিজাত শ্রেণীর নয়। সাধারণ মানুষকে নায়ক হিসাবে বেছে নিয়েছেন এবং কৃষক পরিবারের মেয়েকে নায়িকার মর্যাদা দিয়ে উপন্যাসকে অনন্য মহিমায় রূপায়িত করেছেন।

'পদ্মা' উপন্যাসে প্রমথনাথ বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে বেছে নিয়েছেন সাধারণ বিষয়, এই সাধারণ বিষয় অসাধারণ হয়ে উঠেছে বক্তব্যের উপস্থাপনায় যা শিল্পরূপের পরিচয়বাহী।

# ‘কোপবতী’ - (১৯৪১)

‘কোপবতী’ (১৯৪১) উপন্যাসের কাহিনী ও চরিত্র রূপায়িত হয়েছে কোপাই নদীকে কেন্দ্র করে। কোপাই আসলে এই কাহিনীর নায়িকা কিংবা নায়িকার মধ্যে অন্যতমা রূপে বিরাজিত। স্বাভাবিক কারণেই নদীকেন্দ্রিক এই উপন্যাসে নৈসর্গিক পটপরিবেশ এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে।

‘কোপবতী’র ভৌগোলিক পটভূমি রাঢ়বঙ্গের বীরভূম জেলার অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র ভূখন্ড তালবনী গ্রামকে কেন্দ্র করে গঠিত। তবে উপন্যাস কাহিনী শুধুমাত্র তালবনীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নি কঙ্কালীতলা, তালপুকুর, শান্তিনিকেতন, বোলপুর, দুবরাজপুর, নলহাটি প্রভৃতি স্থান পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছে। উপন্যাসের মূলকাহিনী আবর্তিত হয়েছে তালবনী গ্রাম কিংবা ডাঙাপাড়ার বুক চিরে প্রবাহিত কোপাই নদীকে কেন্দ্র করে। লেখক কোপাই নদীকেই কাব্যব্যঞ্জনাময় ভাষায় নামকরণ করেছেন ‘কোপবতী’। যার উৎসভূমি সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত একটি ভূবিবর এবং এটি বক্রেশ্বর নদে এসে আত্মসমর্পণ করেছে। এর দুই তীরে শস্যশ্যামল প্রান্তর আবার কোথাও গভীর বনভূমি শাল, তাল, পলাশ ও সেগুনের সারি। মানুষ ও প্রকৃতি এখানে স্বতন্ত্র নয়, সহোদরা বিধাতার যমজ সন্তানের মতো। আবাল্য প্রকৃতি প্রেমিক প্রমথনাথ সমাজ ও পরিবারের চিত্রের সঙ্গে নিসর্গপটের মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। আলোচ্য উপন্যাসে প্রকৃতি চেতনা তাই স্বতন্ত্র উপাদান হয়ে ওঠে নি এর সঙ্গে মানবজীবনের গভীর সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন। আলোচ্য উপন্যাসে নিসর্গচেতনা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেখা গেলেও তাদের সমন্বয়ে একটি ল্যান্ডস্কেপ বা চিত্রপট উদ্ভাসিত হয়ে

পরিবেশকে শিল্পসুষমা মন্ডিত করে তুলেছে।

উপন্যাস কাহিনীর বিষয়বস্তু হল প্রাক্‌বিবাহিত ও দাম্পত্য প্রেমের মধ্যে বৈপরীত্য। প্রকৃতির মায়াবী আকর্ষণে বিমলের সলিল সমাধি যেন প্রকৃতি চেতনার অনবদ্য নিদর্শন সৌন্দর্য অনুভবের বাস্তব রূপের মধ্যে এই বৈপরীত্য ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠেছে।

আলোচ্য উপন্যাসের ঘটনাকাল মাত্র দেড় বছর। তবে প্রমথনাথের ব্যক্তিজীবনের কিছু কিছু ঘটনা উপন্যাসের নায়ক চরিত্রের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। লেখক অতীত স্মৃতি চারণা করেছেন বর্তমানের পটভূমিতে তাই 'কোপবতী' উপন্যাসটির কাল নিঃসন্দেহে মিশ্রকাল। তবে উপন্যাসটি স্বল্পকালের মধ্যেই সমাপ্তি ঘটেছে এর কালব্যাপ্তি খুবই কম। কলকাতা থেকে বিমল উচ্চশিক্ষা লাভ করে ফিরে এসেছে তালবনীতে। ঘটনাক্রমে বাঘের সঙ্গে লড়াই-এ অসুস্থতা ও পতিতপাবনবাবুর নাতনী ফুল্লরার সঙ্গে প্রথম পরিচয় ও প্রেমের উন্মেষ। ফাল্গুনী পূর্ণিমায় কোপাই নদীর তীরে বনলক্ষ্মীর নিমন্ত্রণ লিপি পেয়ে বিমল ও ফুল্লরার রোমান্টিক প্রেমানুভূতি লেখক বর্ণনা করেছেন। বনদেবীর সাজে সজ্জিত হয়েছে এই প্রেমানুভূতি ছিল স্বর্গীয়। নায়ক নায়িকার প্রেমঘন মাধুর্য এক অপরূপতা লাভ করেছে। এর পরিণতি ঘটেছে বৈশাখের দ্বিতীয় সপ্তাহে বিবাহের মধ্যে। বিবাহের তিন মাস পর থেকে সংসারজীবনে মান অভিমানের পালা শুরু হয়। এসময় কলকাতার এক কলেজে প্রফেসারিতে যাবার প্রাক্‌মুহূর্তে কোপাই-এর কলধ্বনি শুনে কোপাই গর্ভে বিমলের সলিল সমাধি ঘটে। তালবনীতে থাকাকালে কয়েক বছরে বিমলের দুটি সত্তার সঙ্গে পরিচয় ঘটেছে তারা হল ফুল্লরা ও কোপাই; মানুষ ও প্রকৃতি। এই দুই সত্তা তার অস্তিত্বের সঙ্গে মিশে গিয়ে জীবনের রূপ পরিবর্তন করে দিয়েছে। পরিশেষে সে প্রকৃতিকেও পেল না মানুষকেও হারাল।

'কোপবতী' উপন্যাসে পতিতপাবন বাবুর পরিবার ও বিমলের পরিবার এই দুই পরিবারের কাহিনী। মিতন বিমলের ভৃত্য, এছাড়া মিশকি ও দুএকটি সাঁওতাল চরিত্র উপন্যাসে দেখা যায়।

লৌকিক উৎসব, আচার, ধর্মবিশ্বাস ইত্যাদির যেমন বাস্তববোধের পরিচয় ফুটে উঠেছে ঠিক তেমনি গ্রামীণ ডাকঘরটি বারোয়ারী পঞ্চায়েত ও বৈঠকখানা রূপে পরিচিত যা বাস্তবসম্মত। তবে বিমলের পরিণতিবাস্তবতা বর্জিত। এখানে নিয়তিবাদ প্রাধান্য পেয়েছে। এই ঘটনাকে বিশ্বাসযোগ্য করবার জন্য প্রমথনাথ বিমলকে মানসিক রোগগ্রস্ত করে তুলেছেন। বিমলের বিশ্বস্ত অনুচর মিতনের অনন্ত প্রতীক্ষার মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক কাহিনীর পরিসমাপ্তি টেনেছেন।

ঔপন্যাসিক কাহিনী ও চরিত্রবর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে বিভিন্ন চরিত্রের রূপ বর্ণনা করেছেন।

ঘটনাধারার বিমলের কোপাই-এর উৎস সন্ধানে যাত্রা লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের প্রতিফলন। বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে স্থানে স্থানে সাঁওতালী ভাষার আমদানি করেছেন। উপন্যাসে অশ্লীল শব্দের প্রয়োগ কোথাও কোথাও দেখা গেছে অথচ তা রসহানি ঘটায় নি।

'কোপবতী' উপন্যাসে নাগরিক সভ্যতাকে উপেক্ষা করে পল্লী প্রকৃতির মোহময় আকর্ষণে লেখকের দৃষ্টি নিবদ্ধ।

## 'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার' – (১৯৩৫)

'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার' উপন্যাসের ইতিহাসের প্রেক্ষাপটটি মুখ্যতঃ রাজসাহী

ও পাবনা জেলার ভৌগোলিক পটভূমিকায় গড়ে উঠেছে। রাজসাহী ও পাবনা জেলার অন্তর্গত জোড়দীঘি গ্রাম, রক্তদহ গ্রাম, চলনবিল, পলাশী, নাটোর, কইজুড়ি এই উপন্যাসের পটভূমি।

প্রমথনাথ বিশীর ত্রয়ী উপন্যাস যা তাঁর প্রথম পর্বের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি এবং যা পরবর্তী কালে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে 'জোড়াদীঘির উদয়াস্ত' (১৯৬৬) নামে প্রকাশিত হয় মূলতঃ তাঁর পারিবারিক পরিবেশ এবং রাজসাহীর পাশ্ববর্তী উত্তরবঙ্গের জীবনধারাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এবং এখানে তিনি মূলতঃ পল্লীবাংলার ক্ষয়িষ্ণু ধনতান্ত্রিক সমাজের ছবি এঁকেছেন।

'জোড়দীঘির উদয়াস্ত' উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে প্রমথনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সময়কালে বাংলাদেশে সামন্ততান্ত্রিক ভাবধারা প্রভাবিত সমাজব্যবস্থা স্বচ্ছন্দ গতিতে প্রবাহিত হচ্ছিল। প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদারী মেজাজ মুখ্য স্থান অধিকার করে ছিল, এজন্য সাধারণ শ্রেণীভূক্ত নাগরিকদের আশা আকাঙ্ক্ষা কোনরূপ প্রাধান্য পায় নি। একারণেই বঙ্কিমচন্দ্র সৃষ্ট উপন্যাসের পটভূমি নির্বাচনে পল্লীবাংলার জীবনধারা বর্ণিত হলেও চরিত্র নির্মিতিতে সামন্ততন্ত্রের প্রতিভুরূপে জমিদার তথা অভিজাত শ্রেণীকেই নির্বাচন করেছিলেন। গোবিন্দলাল, নগেন্দ্রনাথ, ব্রজেশ্বর, মহেন্দ্র, প্রতাপ এরা সকলেই জমিদার সম্প্রদায়ভূক্ত। রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' উপন্যাসের মহেন্দ্র, বিহারী, 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের নিখিলেশ, 'যোগাযোগ' উপন্যাসের মুকুন্দলাল ও বিপ্রদাস, 'দুই বোন' উপন্যাসের রাজারাম এরা প্রত্যেকেই জমিদার। শরৎসাহিত্যেও জমিদার চরিত্রের অভাব নেই।

বঙ্গদেশের সমাজজীবনধারা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় দীর্ঘকাল ধরে এখানে জমিদারী সামন্ততন্ত্র প্রচলিত ছিল। বলাবাহুল্য মোগল সাম্রাজ্যের পতনের যুগ থেকে জমিদার শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছিল। এদেশের অর্থনীতিতে ও সমাজজীবনে জমিদারী প্রথা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছিল সন্দেহ নেই। এ বিষয়ে অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাসঙ্গিক মন্তব্য উদ্ধার করা যেতে পারে ঃ-

" আমাদের সামাজিক ইতিহাস লেখক ও ঔপন্যাসিকগণ একটা কথা বিশেষ স্মরণ রাখেন না যে, মধ্যযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া গত দুই তিন শতাব্দী জমিদার বংশই প্রদেশের প্রাণ শক্তির কেন্দ্রস্থল ও আধার ছিল। এই কার্যতঃ স্বাধীন, অপ্রতিহত প্রভাব ভূস্বামীকূলের আদর্শ আকাঙ্ক্ষা, বিলাসব্যসন, অত্যাচার, আশ্রিত বাৎসল্য, সৌন্দর্যরুচি ও গুণগ্রাহিতাকে কেন্দ্র করিয়াই জাতীয় জীবন যাত্রা আবর্তিত হইয়াছে। গত দুই তিন শত বৎসরের দেশকে বুঝিতে হইলে এই জমিদারদিগকে বুঝিতে হইবে - তাহাদেরই কেন্দ্র বিকীরিত শক্তি দেশের প্রান্তদেশ পর্যন্ত বিস্তৃতি হইয়াছে। জনসাধারণের বিশেষ কোন আত্মস্বাতন্ত্র্য বা আত্মনির্ধারণ শক্তি ছিল না - জমিদারের প্রভাবই তাহাদের প্রাণস্পন্দনের গতিবেগ ও ক্রিয়াশীলতার বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করিয়া দিত। দেশের মধ্যে যে দুর্ধর্ষ নিয়ম শৃঙ্খলার পরিপন্থী বিদ্রোহ শক্তি ছড়ান ছিল, তাহা জমিদারের অত্যাচারের দ্বারাই উত্তেজিত হইয়া ঐক্য ও সংহতি লাভ করিত। জমিদারের দানশীলতা নদী প্রবাহের ন্যায় দুই ধারে শ্যামলতা বিস্তার করিত। তাহার দৃপ্ত পৌরুষ জাতির শক্তিকে উদ্‌বোধিত ও সংঘবদ্ধ করিত, তাহার ক্রমপ্রসারিত দাবী দাওয়া জনসাধারণের বৈষয়িক বুদ্ধি ও স্বভাবসিদ্ধ চাতুরতাকে তীক্ষ্মধার করিয়া তুলিত। সুতরাং জাতির মুখপাত্র ও নেতা হিসাবে এই অভিজাত বর্গের সাহিত্য ও ইতিহাসে স্থান আছে।" [৪]

জমিদার শ্রেণীর সাহিত্যে যে স্থান আছে তা অস্বীকার করা যায় না। বাংলা সাহিত্যে জমিদার শ্রেণী কখনও বীরত্বে, ধনপ্রাচুর্যে, শৌর্যে যে বিচিত্র সৌন্দর্য সৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দু হবার যোগ্য বিদগ্ধ সাহিত্য সমালোচক ও অধ্যাপক ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় একথাই বলতে চেয়েছেন।

তাঁরাশঙ্কর তাঁর 'জবানবন্দী' উপন্যাসে প্রায় দুশ বছরের বিস্তারিত জমিদারী ব্যবস্থার ইতিহাস তুলে ধরেছেন। ছয় পুরুষের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে আলোচ্য উপন্যাসে।

প্রমথনাথ 'জোড়াদীঘির উদয়াস্ত' উপন্যাসে প্রায় দেড়শত বৎসরের জমিদারী ব্যবস্থার ইতিহাস পাঁচ পুরুষের কাহিনীতে রূপায়িত করেছেন। তারা হলেন উদয়নারায়ণ, কন্দর্পনারায়ণ, দর্পনারায়ণ, দীপ্তিনারায়ণ ও কীর্তিনারায়ণ। জমিদার উদয়নারায়ণের পুত্র কন্দর্পনারায়ণ, পৌত্র দর্পনারায়ণ ও প্রপৌত্র দীপ্তিনারায়ণ চৌধুরী পরিবারের চতুর্থ পুরুষ রূপে স্থান পরিগ্রহ করেছে। দীপ্তিনারায়ণের পুত্র পঞ্চম পুরুষ।

প্রমথনাথ অতীতে ঐতিহ্যের বিশ্বাসী। সামন্ততান্ত্রিক ঐতিহ্যে লালিত হয়ে জমিদারী বিলাস বৈভব, শৌর্য, বীরত্বের প্রতি তিনি মোহমুগ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রয়াসে সামন্ততন্ত্রের প্রেক্ষাপট বেছে নিয়েছেন। জমিদারদের প্রতি প্রমথনাথ ছিলেন সহানুভূতিশীল। ইতিহাসের অমোঘ বিধানে জমিদারতন্ত্রের বিলয় ঘটলেও মনে প্রাণে প্রমথনাথ জমিদারী অবক্ষয়কে মেনে নিতে পারেন নি একনৈরাশ্য বেদনা তাকে পীড়িত করেছিল প্রতিনিয়ত।

'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার' উপন্যাসে বাংলার জমিদার সম্প্রদায়ের উদ্ভবের ইতিহাস কৌতূহলপূর্ণ ও গভীর চিন্তার আলোকে তুলে ধরেছেন। ঐতিহাসিক পটভূমিকায়

জোড়াদীঘি গ্রামের চৌধুরী পরিবার বংশের ঐতিহাসিক বিবরণ দিয়ে শুরু করেছেন — বল্লাল সেনের সময়কাল থেকে এই পরিবারের পূর্বপুরুষের কিছুটা পরিচয় দিলেও মোঘল সম্রাট আকবরের সভাপন্ডিত নীলকণ্ঠ ওঝা এদের আদি বংশধর বলে লেখক উল্লেখ করেছেন। এরপর চৌধুরী পরিবারের ষষ্ঠপুরুষ রামহরি ও গঙ্গাহরি জোড়াদীঘি গ্রামে বাস করত। গঙ্গা হরির সন্তানদের নিয়ে জোড়াদীঘির চৌধুরী বংশ প্রতিষ্ঠিত। গঙ্গাহরি পুত্র রূপনারায়ণের পূর্ব পর্যন্ত চৌধুরী বংশের অবস্থা ছিল খুবই সঙ্কটপূর্ণ। রূপনারায়ণের পুত্র উদয়নারায়ণের সময়কাল থেকেই চৌধুরী পরিবারের জমিদারীবৃদ্ধি ঘটে। তবে এই জমিদারীবৃদ্ধির ইতিহাস সহজ সরল পথে আসে নি। এই পরিবারের পূর্বপুরুষরা ডাকাতি করত। জলাজঙ্গলে পরিপূর্ণ চলনবিলই ছিলই ডাকাতির অন্যতম কেন্দ্র। এই বিলই ছিল রাজসাহী ও পাবনার যাতায়াতের প্রধান যোগসূত্র। ছিপ্ নৌকা, ডিঙ্গি নৌকা, এক একজন ডাকাত সর্দারে র ছিল সংখ্যায় দুতিন শত। বন্দুক, বর্শা, লাঠি, সড়কি এগুলোর সাহায্যে বজরা আরোহীদের নির্মম ভাবে হত্যা করে দ্রব্যসামগ্রী লুটপাট করত। অজ্ঞতার অন্ধকারে নিজের জামাতাকেও হত্যা করেছিল চৌধুরীদের পূর্বপুরুষ। এছাড়া ক্রয়ের নাম করে চুন, ইট, কাঠ, পাথর নৌকা থেকে নামিয়ে নিয়ে অর্থপ্রদান না করে বিক্রেতাদের তাড়িয়ে দিত। সেই ইট দিয়েই তৈরী হয়েছিল চৌধুরীদের দালানবাড়ি ।

'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার' উপন্যাসটির মূল বক্তব্য হল — জোড়াদীঘির জমিদার দর্পনারায়ণ ও রক্তদহের জমিদার পরন্তপের বিরোধের ইতিহাস। ইতিহাস সচেতন লেখক বাংলার জমিদার সম্প্রদায়ের উদ্ভবের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণের আলোকে উজ্জ্বলভাবে অঙ্কিত করেছেন।

চৌধুরী পরিবারের উদয়নারায়ণের সময়কাল থেকেই জমিদারী বৃদ্ধির সূচনা হয়। সমগ্র উপন্যাসটির একদিকে অশীতিপর বৃদ্ধ উদয়নারায়ণের কাহিনী ও কুড়ি বছরের যুবক পৌত্র দর্পনারায়ণের কাহিনীই মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। মাঝখানে এক পুরুষের আকস্মিক মৃত্যু ঘটে। উদয়নারায়ণের জন্মকাল পলাশীর যুদ্ধের পঁচিশ বছর আগে ১৭৩২ খ্রীঃ অঃ এ নায়ক উদয়নারায়ণের জীবননীতি নির্ধারিত হয়েছে ইংরেজ আমলের বহু আগে নবাবী আমল থেকে।

'জোড়াদীঘির উদয়াস্ত' উপন্যাসের সময়কাল প্রসঙ্গে গ্রন্থ পরিচিতি অংশে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন—

" উপন্যাস ত্রয়ীর বিরাট জীবন নাটকের যবনিকা উত্তোলিত হয়েছে পলাশীর যুদ্ধের ভারতবিপর্যয়কারী সংঘটনের ষাট বছর পরে মোটামুটি ১৮২০ খ্রীঃ অঃ ও এই যবনিকা নেমে এসেছে বঙ্গ ও ভারত বিভাগের অব্যবহিত প্রাক্কালে (১৯৪৫ খ্রীঃ অঃ)" [৫]

'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার' উপন্যাসে দুটি জমিদার পরিবারকে কেন্দ্র করে উত্তরবঙ্গের জমিদার সমাজের আভিজাত্য, দম্ভ, মর্যাদার লড়াই, প্রতিশোধ স্পৃহা, সুরা ও নারীর প্রতি আসক্তি, লুঠতরাজ, খাজনা ও বাজার লুঠ, রক্তদহ জমিদার বাড়ি আক্রমণের ফলে তুমুল সংঘর্ষ, পরন্তপের পরাজয় ও বন্দীত্ব, বন্দীত্ব থেকে মুক্তি, দর্পনারায়ণের গ্রেপ্তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত, কোম্পানী শাসনের চরমরূপ প্রভৃতি সামন্ততান্ত্রিক আচরণ এবং তার পরিণতি উপন্যাসে যথাযথ ভাবে চিত্রিত হয়েছে। সেই সঙ্গে জমিদার পরিবারের সংস্কার, আনুষ্ঠানিকভাবে দুর্গোৎসব, প্রসাদ বিতরণের সাড়ম্বরতা, প্রতিমা নিরঞ্জনের ঐতিহ্যময় রীতি, বিশ্বকর্মা পূজা উপলক্ষে ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের সঙ্গে সিঁদুর মাখানো নারকেল কাড়াকাড়ি খেলার

আকর্ষণ, জমিদার পরিবারের বংশধরদের শিক্ষা, অস্ত্রবিদ্যার অনুশীলন, ঘোড়ায় চড়ার কৌশল প্রভৃতি বিষয় লেখক শিল্পসমৃদ্ধ করে তুলে ধরেছেন।

এছাড়া পলাশীর ক্ষয়িষ্ণু জমিদার পরন্তপের লোলুপদৃষ্টি থেকে দর্পনারায়ণের বনমালাকে উদ্ধার, বনমালার সঙ্গে দর্পনারায়ণের বিবাহ, চাঁপার সঙ্গে বাণী বিজয়ের সম্পর্ক, পলাশীর যুদ্ধের বর্ণনা, ইন্দ্রাণীর প্রতিশোধস্পৃহা, ইংরেজ চরিত্রের উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে কাহিনীর ঐতিহাসিক কাল পরিধিকে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন লেখক।

উপন্যাসটি শুধুমাত্র দুই জমিদার পরিবারের সামন্ততান্ত্রিক আচরণেই শুধু নয় এখানে পাবনা ও রাজসাহী অঞ্চলের স্থানীয় ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলেছেন কথাশিল্পী প্রমথনাথ। সাধারণ জনজীবনের নানা প্রতিফলনও উপন্যাসটিতে যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

চলনবিল উপন্যাসটিতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। ঔপন্যাসিক চলনবিলের যেমন আদিম হিংস্র রূপের বর্ণনা করেছেন তেমনি কবিত্বপূর্ণ ভাষায় এর শান্ত, কল্যাণকর, স্নিগ্ধ রূপটি ফুটিয়ে তুলতে ভোলেন নি।

জোড়াদীঘির জমিদার পরিবারের বংশধারার পরিচয় রূপায়িত করতে গিয়ে শিল্পী প্রমথনাথ উত্তরবাংলার নদীনালার ভৌগোলিক পটভূমিকায় চিত্রধর্মী বর্ণনা কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন নিষ্ঠার সঙ্গে। জোড়াদীঘির জমিদার উদয়নারায়ণের স্নেহধন্য পৌত্র দর্পনারায়ণ পলাশীগ্রামের দরিদ্র ব্রাহ্মণ রমাকান্ত রায়ের কন্যা বনমালাকে বিবাহ করলে তার মনোনীত রক্তদহের রক্তকমল ইন্দ্রাণীর সঙ্গে বিয়ে ঠিক হওয়া সত্বেও জমিদারী ঐতিহ্যের দিকে তাকিয়ে উদয়নারায়ণ নবদম্পতিকে স্থান দেয় নি। তখন দর্পনারায়ণ পত্নী বনমালাকে নিয়ে পদ্মাবক্ষে

ঘুরে বেড়াতে থাকে এই অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পটভূমিকায় প্রমথনাথ নদীপ্রকৃতির লাবণ্যময় বর্ণনা, বামনডাঙ্গা ও কইজুড়ি গ্রামের প্রজাদের খাজনাপ্রদান, উপঢৌকন ও সহৃদয়তার যে অপূর্ব বর্ণনা দিয়েছেন যা উচ্চাঙ্গের কবিকল্পনার সাক্ষ্য বহন করে।

কিংবদন্তীরও অভাব নেই উপন্যাসে। দর্পনারায়ণ বনমালাকে বেণীরায়ের কালীপূজায় নরবলির ঘটনা শুনিয়েছেন, সেই সঙ্গে শুনিয়েছেন বেণীরায়ের দোর্দন্ড প্রতাপ যা লেখকের গভীর অনুসন্ধিৎসু মনের পরিচয়বাহী।

এছাড়া চৌধুরী বাড়িতে রক্তদহের জমিদার পরন্তপের জমিদার বাড়ী আক্রমণ উপলক্ষে সমবেত শুকনাগাছির লাঠিয়াল ও চলনবিলের শরকিবাজদের দুর্দান্তপনা, সাহসিকতা ও শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন লেখক। লড়াইকে কেন্দ্র করে বন্দুক, বারুদ ইত্যাদি আগ্নেয়াস্ত্রের উল্লেখ করেছেন ঔপন্যাসিক।

প্রমথনাথের উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রের রূপবর্ণনার ক্ষেত্রে বঙ্কিমী রীতিকেই অনুসরণ করেছেন। উদয়নারায়ণ বনমালার নাম দিয়েছেন ভাগীরথীর শ্বেতপদ্ম। প্রত্যেকটি চরিত্রের দৈহিক বর্ণনায় লেখক অসাধারণ শিল্পবোধের পরিচয় দিয়েছেন। নায়ক উদয়নারায়ণের দৈহিক বর্ণনা কি প্রাণবন্তভাবে দিয়েছেন তা উদ্ধারযোগ্য ঃ—

" দীর্ঘাকৃতি বিরাট পুরুষ, বহুব্যবহৃত বিশাল হরধনুর মত ঈষৎ নত। পক্বকেশ, দাড়িগোফ কামানো, রোমশ ভুরুর নীচেঅচঞ্চল চোখ, কালো দীঘির জলের মত; ক্ষণে ক্ষণে তাহাতে কৌতূহলের কিরণ ঝলকিয়া ওঠে। ভাবপ্রকাশের প্রধান বাহন চোখ। মুখে একটিও কথা বাহির হয় না বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে প্রচুর হাস্যের অট্টরবে অট্টালিকা কম্পিত হইতে থাকে।"[৬]

উপন্যাসে লেখকের রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গী স্থানে স্থানে প্রধান উপাদান হয়ে দাঁড়ালেও বাস্তবতার অভাব ঘটে নি। সমাজ বাস্তবতার প্রতিফলন ঘটে নি। সমাজব্যবস্থায় প্রতিফলন ঘটেছে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদের যুগরুচি ও যুগের প্রতিনিধিরূপে একাধিক উদ্ভট চরিত্র অঙ্কনে। দর্পনারায়ণের জ্ঞাতি ভাই রঘুনাথ ও বিশ্বনাথ, আলিবর্দি, স্বরূপসর্দার, দুই জমিদারের দেওয়ানগণ, ছিদাম বহুরূপী, টোলের ভট্টাচার্য্য, পাঠশালার রঘুপন্ডিত, বোবা আব্বর, পুঁটি গোয়ালিনী, বাণী-বিজয়, বেঙা চৌকিদার, রমেশ ঢুলি তৎকালীন যুগের প্রতিনিধিত্ব করেছে।

এছাড়া কিংবদন্তী, ছড়া, লোকগান, লোককবিতা, প্রবাদ প্রবচন, ভূত তাড়ানো, বাস্তু সাপ, যাত্রাপালা, গুরুশিষ্য সংবাদ প্রভৃতি ইতিবৃত্ত ও সমাজ সংস্কার উপন্যাসের বিষয়।

পরন্তপের গুপ্ত কারাগারে বন্দীত্বের ঘটনায় বার্ডসাহেবের সক্রিয়তা, রাজপ্রতিনিধিরূপে নাটোরের ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটের হস্তক্ষেপে বেআইনী দাঙ্গার অভিযোগে দর্পনারায়ণের সাত বছর জেল ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়। এক প্রভাব প্রতিপত্তিশালী জমিদারের শেষ সম্বলরূপে পড়ে থাকে শুধুমাত্র বাড়িখানা ও সামান্য ব্রহ্মোত্তর জমিটুকু। এরমধ্যে লেখক দেখিয়েছেন একটি যুগের অবসান ও নতুন যুগের আগমনের সূচনা।

দুই জমিদারের সংঘাতে শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধ উদয়নারায়ণ বিধ্বস্ত। তখন দর্পনারায়ণ রাজসাহী কারাগারে। একটি প্রচন্ড ক্ষমতাশালী জমিদারের হাহাকারের মধ্য দিয়ে একটি যুগের অবসান ঘটেছে। চন্ডীমন্ডপের প্রতিমাবিহীন বেদীমূলে উদয়নারায়ণ প্রণাম করে দেবীদুর্গার উদ্দেশ্য করে আক্ষেপ তার জীবনের ট্র্যাজেডি দিয়েই উপন্যাসের পরিসমাপ্তি ঘটে যা প্রচ্ছন্ন জীবন সত্যের ইঙ্গিত।

পরিশেষে বলতে হয় প্রমথনাথ মহাকাব্যিক এই উপন্যাসে ইতিহাসচেতনা, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ ও জীবনধর্মকে সার্থকভাবে প্রতিফলিত করেছেন সন্দেহ নেই।

## 'চলনবিল' - (১৯৪৬)

মহাকাব্যিক 'জোড়াদীঘির উদয়াস্ত' উপন্যাসের পরবর্তী অংশ চলনবিল। যে বিলটিকে কেন্দ্র করে আলোচ্য উপন্যাসের কাহিনী আবর্তিত হয়েছে তা উত্তরবঙ্গের পাবনা জেলার অতীত ইতিহাসের এক উল্লেখযোগ্য স্থান। রাজসাহীর নিকটবর্তী পাবনা জেলার অন্তর্গত এই স্থানটি ছিল দুর্ধর্ষ প্রতাপশালী ডাকাতদের ডাকাতির অন্যতম কেন্দ্র। চলনবিলের এক প্রান্তে ধুলোউড়ি অন্যপ্রান্ত পারকুল, কইজুড়ি, গুরদাসপুর প্রভৃতি গ্রাম এই উপন্যাসের ভৌগোলিক পটভূমি। কাহিনী বিস্তারের প্রয়োজনে ঔপন্যাসিক বগুড়া জেলার রায়নগর গ্রামকে উপন্যাসে এনেছেন।

উপন্যাসের নায়ক হিসেবে দর্পনারায়ণকে আমরা পেলেও এক অর্থে চলনবিল কাহিনীর অন্যতম নায়ক। কাহিনীর শুরু থেকে সমাপ্তি অবধি চলনবিলের ভূমিকা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বর্ষা ও গ্রীষ্ম এই দুটি ঋতুকে ঘিরেই এখানকার ঋতুচক্র আবর্তিত হয়। বর্ষাকাল চলনবিলের ভরা মরশুম — এসময়ে চলনবিলের কালো জলে আদিম মনোবৃত্তির পটভূমি রচনা করে, শস্যহীন, ক্ষেত্রহীন, গৃহহীন নিঃশব্দের আদিম জগৎ সৃষ্ট হয়। মানুষ তখন রুদ্র প্রকৃতির অসহায় ক্রীড়নক মাত্র। মানুষের চেহারাও চলনবিলের মত শ্বাপদসঙ্কুল হয়ে ওঠে।

দিগন্তবিস্তৃত কালো জলে ছিপ নৌকা নিয়ে সশস্ত্র অবস্থায় ডাকাতরা দলে দলে বেড়িয়ে পড়ে। ডাকাতদের সময় বর্ষাকাল ও বিলের সময় বর্ষাকাল, বিল ডাকাতদের ধাত্রী। গ্রীষ্মের এক দুমাস আগে ডাকাতের দল নদীমাতৃক উত্তরবঙ্গে কৃষক সেজে ফসল ফলায় তখন গ্রামবাসীদের মধ্যে প্রীতিমধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এখানে শ্রেণী মাত্র দুটি ডাকাত ও ভালোমানুষ হিন্দু-মুসুলমান কোন ভেদ নেই। এভাবে প্রকৃতি পটভূমিকায় আবেষ্টনীরেখা রচিত হয় সেখানে।

যুগ পরিবর্তনশীল — তেমনি সমাজ পরিবর্তনশীল। সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জীবনধারায় সামাজিক তাৎপর্য পরিবর্তিত হয়। ইতিহাসের রথচক্রতলে জমিদারী ব্যবস্থার অবক্ষয় নেমে আসে। ক্ষয়িষ্ণু জমিদারদের আভিজাত্য, বিলাসব্যসন, আড়ম্বর ইত্যাদি অতীত ঐতিহ্য লুপ্ত হয়ে যায় প্রচলিত সমাজের ভাঙনের ফলে জন্ম নেয় নূতন যুগ, নূতন মূল্যবোধ গড়ে ওঠে । জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবারের জমিদারদের সামন্ততান্ত্রিক প্রভাবের অবসান ঘটে, নতুন যুগে এসে উপন্যাসের নায়ক দর্পনারায়ণ যুগোপযোগী গঠনমূলক অভীপ্সায় রূপান্তরিত হয়, জনকল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণ করে, ডাকাতদের আক্রমণে রক্ষকের ভূমিকা পালন করে কিংবা প্রাকৃতিক দুর্যোগকে প্রতিহত করবার জন্য সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। বন্যাকে নিয়ন্ত্রণে আনবার জন্য ধুলোউড়ি বাসিন্দাদের নিয়ে বাঁধ নির্মাণের কাজে ব্যস্ত হয়। এক কৃষিনির্ভর সমাজকে গড়ে তুলবার উদ্যোগ গ্রহণ করে।

রাজসাহী কারাগার থেকে সাত বছর পর মুক্ত হয়ে জমিদারীর স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি হারিয়ে সহায় সম্বলহীন দর্পনারায়ণ আশ্রয় নেয় জোড়াদীঘি থেকে দূরে ধুলোউড়ির

কুঠিবাড়ীতে যা ছিল জনহীন পরিত্যক্ত জীর্ণ কুঠি। সঙ্গে ছিল দর্পনারায়ণের প্রিয় ঘোড়াটি এবং প্রপিতামহ ও স্ত্রীকে হারিয়ে শিশুপুত্র দীপ্তিনারায়ণ ও তার অনুচর মুকুন্দ। সেই জীর্ণ কুঠিবাড়িটি সংস্কার করে বাসযোগ্য করে তোলে। ধুলোউড়ি গ্রামের প্রধান ডাকুরায় নতুন আগন্তুককে দেখে দ্বিধাহীন চিত্তে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। আধিপত্য প্রতিষ্ঠা প্রয়াসী ভেবে ডাকুরায়ের সঙ্গে দর্পনারায়ণ চৌধুরী পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে। যোগ্য ঘোরসওয়ার দর্পনারায়ণকে পাগলা চৌধুরী হিসেবেই ধুলোউড়ি গ্রামের বাসিন্দারা চেনে।

রক্তদহ গ্রামের জমিদার পরন্তপ রায় অর্থনৈতিক সচ্ছলতার সূত্র ধরে সুরা ও নারীর প্রতি আসক্ত হয়। চাঁপার সঙ্গে তার পরকীয়া প্রেম যখন সীমাকে লঙ্ঘন করে ব্যাভিচারে পরিণত হয়ে গিয়েছিল তখন রক্তদহের কর্ত্রী ব্যক্তিত্বময়ী ইন্দ্রাণী কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে পরন্তপ ও চাঁপা পারকুলে আশ্রয় গ্রহণ করে। সেই গ্রামের দুর্ধর্ষ ডাকাতদলের সর্দাররূপে পরন্তপের জীবনধারা ভিন্নপথে পরিচালিত করে। স্বল্পকালের মধ্যে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক বিদ্বেষে রূপান্তরিত হয়। অন্ধকুসংস্কারে বশবর্ত্তী হয়ে মেয়ে সুজানিকে মেরে ফেলতে উদ্ধত হয় তার বদ্ধমূল ধারণা সুজানি জন্মাবার পর চলনবিলের নাব্যতা কমে এসেছে। পরন্তপ ভেবেছিল — ইন্দ্রাণীর গর্ভে সন্তান হলে তার জীবনের গতি ভিন্ন পথে পরিচালিত হত। চাঁপা পরন্তপের ক্ষণিক মিলনের পর তীব্র বিরাগ ও মানসিক বিদ্বেষে চাঁপা অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে ও পরিনামে তার মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটে। ঔপন্যাসিক এখানে দেখিয়েছেন লাম্পট্য দোষ মানুষকে কত নিম্নস্তরে নিয়ে গিয়ে করুণ পরিণতির দিকে ঠেলে দেয়।

ঔপন্যাসিক এখানে কয়েকটি মাত্র পরিবার নিয়ে কাহিনীর জাল বিস্তার করেছেন। ডাকুরায় পরিবার, দর্পনারায়ণ ও পরন্তপ পরিবার, সচ্ছল কয়েকটি গৃহস্থ পরিবার

ও মোহনদের পারিবারিক কাহিনী বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীতে ফুটিয়ে তুলেছেন।

চলনবিলের সমস্যা একদিকে নৈতিক, দর্পনারায়ণ আপ্রাণ চেষ্টা করেছে কৃষিনির্ভর সমাজ গড়ে তুলতে, আতঙ্ককর সমাজজীবনকে পরিহার করে। অপরদিকে তার অতীতস্মৃতি প্রতিনিয়ত তাকে কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছিল বলেই পুত্র দীপ্তিনারায়ণকে অস্ত্রচালনা, ঘোড়ায় চড়া মোহনকে দিয়ে শিখিয়ে তাদের প্রধান শত্রু রক্তদহের জমিদার পরন্তপের প্রতি প্রতিশোধাকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করিয়ে শপথ করিয়ে নেয়। এই বালককে পরন্তপ রায়ের উপর প্রতিহিংসাতে দীক্ষিত করাই দর্পনারায়ণের জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল। একদিন দর্পনারায়ণ দীপ্তিনারায়ণকে নিয়ে জোড়াদীঘিতে তার পূর্বপুরুষ নির্মিত প্রাসাদশ্রেণীর ধ্বংসাবশেষের ছবি তার স্ত্রী বনমালার ভাঙা পালঙ্ক, বনমালার পুরনো ছবি, অন্দরমহলের দালান, দশবছর আগেকার বড় বড় অট্টালিকার স্মৃতি, দর্পনারায়ণের অনন্তবেদনা মথিত করে তুলেছিল এবং পুত্রকে জড়িয়ে ধরে পাগলের মতো আর্ত চিৎকার করে ওঠে পুত্রকে বলে ঃ

"দীপ্তিনারায়ণ, তুমি বনমালার সন্তান। আর তার চেয়েও বেশী করে তুমি জোড়াদীঘির চৌধুরী! রক্তদহের জমিদার পরন্তপ রায়কে তার প্রাপ্য দন্ড দেবার ভার তোমার উপর — বনমালার, তোমার জননীর, এই দাবী তোমার প্রতি। রক্তদহের জমিদার বংশকে কখনো তুমি ক্ষমা করবে না, শত্রু পক্ষ বলে মনে করবে জোড়াদীঘির চৌধুরীদের এই দাবী তোমার প্রতি!" [৭]

দর্পনারায়ণ একাধিকবার সুযোগ পেয়েছিল পরন্তপকে শাস্তি দেবার। পূর্ববর্ত্তী উপন্যাসে দুর্গাপূজার যাত্রাপালা উপলক্ষে জোড়াদীঘিতে পরন্তপের আসবার পর তরবারি দিয়ে দুজনের মৃত্যুপণ লড়াই কালে পরন্তপের তরবারি ছিটকে পড়ে, এসময় দর্পনারায়ণ

প্রতিশোধ নিতে পারত কিন্তু ইন্দ্রাণীর কথা ভেবে সে প্রতিশোধ নেয় নি। 'চলনবিল' উপন্যাসে গুরুদাসপুরে ডাকাতি করতে গিয়েছিল পরন্তপ। দর্পনারায়ণ রক্ষকের ভূমিকা পালন করতে গিয়ে পরন্তপকে দেখে বন্দুক সে নীচে নামিয়েছিল, সেই মুহূর্তে ইন্দ্রাণীর মুখচ্ছবি ভেসে উঠেছে তাই তাকে গুলিবিদ্ধ করে নি। ইন্দ্রাণীর প্রতি দর্পনারায়ণের নিরুদ্ধ প্রেম ছিল তার কোন পরিচয় দর্পনারায়ণের জীবনে নেই। তবুও ইন্দ্রাণীর প্রতি দর্পনারায়ণের সুপ্ত মোহ যে ছিল পূর্বোক্ত ঘটনায় তা সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন শিল্পী প্রমথনাথ। এখানে তাঁর গভীর জীবনবোধের পরিচয় ফুটে উঠেছে ও সূক্ষ্মভাবে লেখক তা বিশ্লেষণ করেছেন।

প্রমথনাথ আলোচ্য উপন্যাসে মোহন কুসমির বাল্য প্রেম অনবদ্যভাবে দেখিয়েছেন। লেখক জানিয়েছেন কুসমির দেহ জেগেছে কিন্তু মন জাগে নি। তাদের প্রেমলীলা মধ্যযুগীয় কাহিনীতে আধুনিক মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে। চলনবিল থেকে পদ্মফুল সংগ্রহ করে কুসমিকে সাজানো, কুসমির সঙ্গে সরষে ক্ষেতে লুকিয়ে থাকা, দূরবীন দিয়ে কুসমিকে দূর থেকে দেখা, রাত্রে মোহনের করুণ বাঁশির সুর এক রোমান্টিক প্রেমঘন আলেখ্য প্রমথনাথ তুলে ধরে প্রাণময় করে তুলেছেন। কাহিনীর শেষ অংশে মোহন জানতে পেরেছে কুসমি বিধবা। কুসমি জানতে পারে নি যে তার ছোটবেলায় বিয়ে হয়ে স্বামী মারা গেছে। যখন জেনেছিল যে সে বিধবা তখন কুসমি বলেছিল বিধবাদের বিয়ে হয় নাকি? প্রমথনাথ কুসমি মোহনের বিয়ে দেন নি। বিধবা বিবাহ সমাজে প্রচলিত ছিল কিন্তু সনাতনপন্থী লেখক প্রমথনাথ বিধবা বিবাহকে সমর্থন করেন নি।

'চলনবিল' উপন্যাসে পরন্তপ চরিত্রটি পিকারেস্ক জাতীয়। তার মত পৈশাচিক প্রবৃত্তি,

নারীমাংসলোলুপ, নীতিজ্ঞানহীন চরিত্র বঙ্গসাহিত্যে বিরল। পাশবিক প্রবৃত্তি মানুষকে কত নীচের দিকে নিয়ে যেতে পারে তার জ্বলন্ত উদাহরণ পরন্তপ চরিত্র। সে বিশ্ববিধান লঙ্ঘনের দায়ে অভিযুক্ত। নিজকন্যা সুজানি ওরফে কুসমির প্রতি প্রলুব্ধ দৃষ্টি, তাকে বিয়ে করবার বাসনা, মোহনকে বাবলা গাছে বেঁধে রেখে বেণীরায়ের ভিটা থেকে নৌকাযোগে পারকুলে এনে শ্লীলতাহানির চেষ্টা নীতিজ্ঞানহীনতার পরিচয়। জন্মদাতা পিতা হয়ে সে কন্যার জন্য কিছু করে নি; এমনকি তাকে হত্যা করতে চেয়েছে। অপরদিকে ডাকুরায় তার পালিতা কন্যার বিবাহের জন্য পাত্র ঠিক করে পিতৃদায়িত্ব পালন করেছে। পিতৃহৃদয়ের বৈপরীত্য প্রমথনাথ দেখিয়েছেন। আরও ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটেছে কুসমিকে বিবস্ত্র করতে উদ্যত হলে কুসমির আর্ত চিৎকারে অর্ধোন্মাদ চাঁপা এসে ধারালো ছুরির আঘাতে পরন্তপকে হত্যা করে। চাঁপার অস্ত্রাঘাতে তার মৃত্যু নিঃসন্দেহে নাট্যানুগ। তার এই করুণ পরিণতি অস্বাভাবিক হয়ে ওঠেনি।

উপন্যাসে ডাকুরায় ও ক্ষেন্তবুড়ির সংলাপ অংশটি বাৎসল্যরসের উল্লেখযোগ্য সংযোজন। পুত্রের প্রতি মায়ের অপত্যস্নেহ সন্তানবাৎসল্যের পরিচায়ক। সন্তানহীন পিতর পালিতা কন্যার প্রতি বাৎসল্যরস উপস্থাপন নিঃসন্দেহে লেখকের শিল্পকুশলতার পরিচয়বহ। পালিত কন্যা কুসমির বিবাহের জন্য সক্রিয়তা, আহত পরন্তপকে পারকুলে পৌঁছে দেয়া এবং তার ব্যক্তিত্বপূর্ণ গৃহজীবন পূর্ণতর রূপে অঙ্কিত করেছেন কথাশিল্পী প্রমথনাথ।

প্রাকৃতিক দুর্যোগে চলনবিল যখন বিধ্বংসী রূপ নেয় তখন চলনবিলের চিত্র পাল্টে যায়। বন্যায় আত্রেয়ী, যমুনা ও পদ্মার অস্বাভাবিক জলোচ্ছ্বাসে বিধ্বস্ত হয়। ধুলোউড়ির কুঠির গ্রামবাসীদের কায়িক শ্রমে দর্পনারায়ণের উদ্যোগে বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য যে একাধিক

বাঁধ নির্মিত হয়েছিল তা রক্ষা করতে গিয়ে দর্পনারায়ণকে জলে ভেসে প্রাণ হারানোর ঘটনা ট্র্যাজিক পরিণতি দান করেছে।

এরূপ প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঘটনা ঘটেছে দূরবীন দিয়ে বাঁধ পাহারা দিতে গিয়ে বজ্রপাতে মোহনের অসুস্থতা।

প্রমথনাথ বিশী একটি বিশেষ অঞ্চলের ভৌগোলিক পটভূমিকায় কিংবদন্তী, ছড়া, লোকপ্রবাদ, লোককাহিনী, বৈষ্ণবীদের কণ্ঠের গান প্রভৃতি লৌকিক উপাদানের সার্থকভাবে ব্যবহার করেছেন। বিষয়বস্তু নির্বাচনে লেখকের সাফল্য প্রশংসাতীত।

## 'অশ্বত্থের অভিশাপ'– (১৯৪৭)

তিন খন্ডে সম্পূর্ণ মহাকাব্যধর্মী 'জোড়াদীঘির উদয়াস্ত' উপন্যাসের তৃতীয় খন্ডের নামকরণ করেছেন 'অশ্বত্থের অভিশাপ'। এই ট্রিলজিই প্রমথনাথের অনবদ্যসৃষ্টি। তবে প্রায় একই বিষয়বস্তু নিয়ে তারাশঙ্করের মৌলিক সৃষ্টি 'জবানবন্দী' জনপ্রিয়তার শীর্ষচূড়ে অবস্থান করলেও প্রমথনাথের উপন্যাস আপন স্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল হয়ে আছে।

প্রমথনাথ এই উপন্যাস কাহিনীর ভূগোল রাজসাহীর জোড়াদীঘি গ্রাম। সামন্ততান্ত্রিক পটভূমিকায় গ্রামজীবনের বৈশিষ্ট্য, সামাজিক রীতিনীতি, সংস্কার, বিশ্বাস, দৈবভক্তি যেমন প্রাচীন সমাজব্যবস্থার ঐতিহ্যবাহী তেমনি ধূর্ত আইনজীবিদের আইনের কূটনৈতিক চাল, মামলা মোকদ্দমা, মিথ্যাসাক্ষী প্রভৃতি বিশ শতকের আধুনিক চিন্তাধারা উপন্যাসে স্থান পরিগ্রহ করেছে। আলোচ্য উপন্যাস শুধুমাত্র রাজসাহীর মানচিত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে নি সুদূর কলকাতা

পর্যন্ত এর বিস্তৃতি ঘটেছে। উপন্যাসের নায়ক নায়িকারা কখনো কখনো কলকাতা থেকে যোগাযোগ রেখেছে। তবুও এখানকার মানুষ ও প্রকৃতি নিয়ে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য চমৎকারভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

'অশ্বত্থের অভিশাপ' উপন্যাসের পটভূমিতে অশ্বত্থ গাছটির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। জোড়াদীঘির প্রাচীন অশ্বত্থ বৃক্ষটিকে কেন্দ্র করেই অশ্বত্থের অভিশাপের কাহিনীর সূচনা। প্রমথনাথ লিখেছেন —

" পরিবর্তন বহুল ও ক্ষণস্থায়ী মানুষের জীবন অপরিবর্তনীয় ও পরিবর্তিতকে সমীহ করে, ভক্তি করে, একপ্রকার ভীতিমিশ্রিত বিস্ময় অনুভব করে শাশ্বতের প্রতি। অশ্বত্থগাছটি গ্রাম জীবনের প্রধান প্রতিষ্ঠান। হিন্দু - মুসলমান, বালক বৃদ্ধ, স্ত্রী এবং পুরুষ সকলেই তাহাকে সম্ভ্রম করিয়া চলে। ..... কিন্তু এই প্রাচীনের মজ্জায় মজ্জায় নবীনের কী রসপ্রবাহ। এই অশ্বত্থ একাধারে প্রাচীন ও নবীন। সে বুঝি ভীষ্মের মতোই ইচ্ছামৃত্যু । পিতামহ ভীষ্মের মতোই সে প্রবীন ও চিরকুমার। গ্রামের লোকের চোখে সে আর বৃক্ষ নয় — সে দেবতা।"[৮]

এক অর্থে প্রবীন অশ্বত্থ বৃক্ষটিই উপন্যাসের নায়ক। বৃক্ষটি বহু শত বৎসরের নীরব সাক্ষীরূপে অবস্থান করেছে। জোড়াদীঘির ছ'আনির জমিদার নবীননারায়ণ তার নামের মতই নবযুগের প্রতিনিধি ও এই উপন্যাসের নায়ক এবং নায়িকা মুক্তামালা খাঁটি মুক্তা সদৃশ তারা দুজনেই আধুনিক সমাজ থেকে উঠে আসা নরনারী। নবীননারায়ণ পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, মুক্তামালা শহরের মেয়ে রুচিশীলা ও শিক্ষিতা রমণী। নায়ক নবীননারায়ণের আধুনিক যুগচেতনা প্রভাবিত সংস্কারমুক্ত চিন্তাধারা এবং নায়িকা মুক্তামালার জোড়াদীঘির মাটি ও

মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলবার কাহিনী ঘটনার বৃহত্তর প্রেক্ষাপট রচনা করলেও অতীত জমিদারী ঐতিহ্যলালিত বিরাট প্রাসাদের ভগ্নাবশেষের মধ্যে 'অশ্বত্থের অভিশাপ' কাহিনীর যবনিকা নেমে এসেছে।

'অশ্বত্থের অভিশাপ' উপন্যাসের ঘটনাকাল বিংশ শতাব্দীর প্রথম চার দশক ভারত তখনও পরাধীনতার নাগপাশে বন্দী। উনিশশ থেকে উনিশশ পয়তাল্লিশের মধ্যে এর কাহিনী আবর্তিত হয়েছে কাহিনীর সমাপ্তি ঘটেছে বঙ্গ ও ভারতবিভাগের কিছু আগে।

কীর্তিনারায়ণের পিতা দীপ্তিনারায়ণ চলনবিল উপন্যাসের কিশোর। উপন্যাসের কাহিনী অব্যবহিত পরবর্তী পুরুষকে ছাড়িয়ে আর এক ধাপের অধস্তন উত্তরপুরুষের জীবনকাহিনী সামন্ততান্ত্রিক ভাবধারায় বিকশিত হয়ে উঠেছে।

উপন্যাসে আধুনিক যুগজীবনের কর্মধারার এক বাস্তব আলেখ্য বিধৃত হয়েছে। আধুনিক যুগ তখন আমলাতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার দ্বারা বিশেষভাবে পরিচালিত হয়ে জটিল প্রেক্ষাপট রচনা করেছে। সাম্রাজ্যবাদী শোষণে শোষিত হচ্ছিল সমাজের বৃহত্তর মানবগোষ্ঠী। বণিক ধর্মী সমাজব্যবস্থা এই শোষণের পথকে প্রশস্ত করে দিয়েছিল। এদের মধ্যে কীর্তিনারায়ণ পিতা ও প্রপিতামহের রক্ত বহন করে জমিদারী আভিজাত্য, দম্ভ ও প্রভুত্বপ্রিয়তাকে স্বীকৃতি জানিয়েছিল। অপরদিকে উচ্চশিক্ষিত নবীননারায়ণ নতুন যুগের বস্তুতান্ত্রিক প্রভাবে আত্মদ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত ও মূল্যবোধহীন উদ্‌ভ্রান্ত সমাজের অসহায় পুতুলরূপে দেখা দিয়েছে যেখানে দক্ষ বাজিকররূপে বিরাজ করেছে ইংরেজ প্রভাব পুষ্ট আমলাশ্রেণী।

'অশ্বত্থের অভিশাপ' উপন্যাসে ঘটনা ও চরিত্র সমাজ জীবনের নিখুঁত প্রতিবিম্ব। ধূর্ত আইনজীবি ও অর্থলোভী ও হয়রানির প্রতিভূরূপে আমলাদের লালফিতার দৌরাত্ম্যে জনগণ

বিধ্বস্ত। এসময় দাঙ্গা হাঙ্গামায় লাঠিয়ালদের লাঠি চলে আদালতে উকিল মুহুরীদের কূটবুদ্ধিতে ছুরিতে শান দেওয়া হয়। শরিকি বিবাদ এখানে ওকালতি প্যাঁচে রূপলাভ করে।

ঐতিহ্যবাহী, শৌর্যপ্রধান সামন্তযুগ কূটনীতি প্রধান হয়ে ওঠে, অর্থনির্ভর বৈশ্যযুগকে ডেকে এনেছে। ওকালতি প্যাঁচে মামলার সাক্ষ্য মিথ্যা সাক্ষ্যে রূপান্তরিত হয় যদিও মিথ্যা সাক্ষ্যের পেছনে অর্থের প্রশ্ন জড়িত থাকে। ছআনি কিংবা দশআনির জমিদার যুগপ্রভাবে আইনযন্ত্রে আত্মসমর্পণ করেছে।

উপন্যাসে ছআনির নায়েব যোগেশ, জমানবিশ ও শুমারনবিশ পঞ্চানন ও বদ্যিনাথ, উকিল তারিনীবাবু, আদালতের চাপরাশী রামপিয়ারী, মুহুরী যতীন প্রত্যেকেই সে যুগের প্রতিনিধি। ছআনির লাঠিয়াল মিলনসর্দার, দশ আনির লাঠিয়াল সর্দার আবেদ আলি, দশ আনির লাঠিয়াল ধনঞ্জয়, রামজয়, তেওয়ারী, ইদ্রিস, গফুর থেকে শুরু করে টোলের সারদা ভট্টাচার্য, দারোগা, প্রজা, খানসামা, মোক্তার চরিত্রগুলি বাস্তবসম্মত। আবার ভজহরির মতো সুস্থ সত্যিকার ধর্মপরায়ণ পল্লীবাসী, শশাঙ্ক আধুনিক যুগের প্রতিনিধিরূপে যজমানীর সঙ্গে সুদের ব্যবসা, জোড়াদীঘির বৃদ্ধ বাসিন্দা হরিচরণ, ভবঘুরে ভিক্ষাজীবি দুর্লভ প্রভৃতি চরিত্রে পল্লীর সহজসরল সাধারণ জীবনের পেছনে মানবমনের রহস্য প্রমথনাথ বাস্তব সচেতনভাবেই ফুটিয়ে তুলেছেন।

মুক্তামালা স্বামীর সম সুখ দুঃখ ভাগিনীরূপে আধুনিক যুগ প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে। জমিদারী কাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে তার ভূমিকাও প্রশংসাতীত। জমিদারী রক্ষার তাগিদে মুক্তামালা জোড়াদীঘির প্রতিটি পরিবারের খবর নেয়, জগার মা, বাদলির সঙ্গে জমিদারীর অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করে, প্রতিবেশী, আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে

সামাজিকতা বজায় রাখে। স্বামীর অর্থসংকটকালে স্বেচ্ছায় স্বর্ণালঙ্কার বিক্রয় করে সমস্যা মেটাতে সহযোগিতা করে। মুক্তামালা অতীত ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। অতীত বীরকীর্তির কথা শুনে স্বামী নবীননারায়ণের সঙ্গে 'পদ্মা'র চরে সান্ধ্য ভ্রমণে বের হয়ে প্রকৃতি ও মানুষের সম্পর্ক স্থাপন করে। ঔপন্যাসিক পদ্মাপারের অনবদ্য বর্ণনা কবিত্ব শক্তিদিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন।

একমাত্র জোড়াদীঘির প্রাচীন অশ্বত্থবৃক্ষই অতীত ইতিহাসের নির্বাক সাক্ষীরূপে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। মানবমনের কামনা বাসনা ও অজস্র ঘটনার নীরব সাক্ষী এই গাছটি।

উপন্যাসের শেষদিকে প্রকৃতির অনিবার্য বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে জোড়াদীঘি গ্রাম। যুগের দম্ভ, বিরোধের বাইরে ভূমিকম্পের অকারণ ধ্বংসলীলায় নবীননারায়ণ ও কীর্তিনারায়ণের জমিদারীর বিলুপ্তি ঘটেছে। ভূমিকম্পে বড়বড় অট্টালিকা, জানালা দরজা আসবাবপত্র ভেঙে গেছে, অট্টালিকার ছাঁদ দেয়াল খসে পড়েছে, কালের সব বনস্পতি উপড়ে গেছে। কিছুদিন পর প্রাচীন অশ্বত্থের গুড়ি থেকে সতেজ, সরল, উন্নত তরুণ অশ্বত্থ তরুর রক্তাভ পত্রগুলো আলোর শিখার মত বাতাসে কাঁপছে। জোড়াদীঘির কল্যাণ ভেবে প্রাচীন বৃক্ষের তরুণ প্রজন্মকে ভক্তিভরে প্রণাম জানাচ্ছে জোড়াদীঘির বাসিন্দা।

কালের গতিকে মেনে নিয়ে ঔপন্যাসিক অতীত যুগের সমাপ্তি টেনেছেন। সেই সঙ্গে বুনেছেন ভবিষ্যতের আশার আলো নিয়ে নতুন বীজ। তাই পুরাতন অশ্বত্থবৃক্ষের গোড়ায় গজিয়ে ওঠা নতুন চারাগাছ আগামী যুগের ইঙ্গিতবহ। কথাশিল্পী উপন্যাসের আরও অগ্রসর হওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন।

প্রত্নতাত্ত্বিকরা বলেন — "যে তুলিতে একদিন জোড়াদীঘির সৃষ্টি করেছিল, সেই তুলিতেই আবার সব মুছে গেল।"

" জোড়াদীঘির নবতম জীবনযাত্রা আবার আরম্ভ হইবে কতকাল পরে ? " [৯]

ঔপন্যাসিক এই উপন্যাসে মহাকাব্যিক পটভূমিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের জীবন ইতিহাস উত্থান পতনের কাহিনী অজস্র চরিত্রের সমাবেশে গড়ে তুলেছেন — সে জগতের আকর্ষণ পাঠকের কাছে চিরন্তন হয়ে রইল।

## "কেরী সাহেবের মুন্সী" - (১৯৫৮)

কথাশিল্পী প্রমথনাথ বিশীর 'কেরী সাহেবের মুন্সী' উপন্যাসটি বঙ্গসাহিত্যের উল্লেখযোগ্য সংযোজন। কথাসাহিত্যের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য শিল্পকর্ম। কলকাতাকে কেন্দ্র করে রচিত বাঙালী জীবনবোধের এক শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার উপন্যাসের মূল উপজীব্য । বাংলা উপন্যাসের মধ্যে এটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য একারণেই যে ঊনবিংশ শতকের ঐতিহাসিক উপন্যাস থেকে বৈশিষ্ট্যগত দিক দিয়ে স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত কেননা এই উপন্যাসে সাধারণ মানুষ উঠে এসেছে লেখকের কলমে।

ইতিহাস আশ্রিত এই উপন্যাসটিতে অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাপ্তি ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভের অর্থাৎ সুদীর্ঘ ২০ বছর সময়কালের ঘটনা পরিব্যাপ্ত। এই যুগসন্ধিকালের দ্বারা চিহ্নিত তৎকালীন কলকাতা, শ্রীরামপুর, মালদহের মদনাবাটী, কাশীপুর, মদনমোহনতলা ও জোড়ামউ গ্রামের পটভুমিকায় লেখা এক অনবদ্য কাহিনী — যখন ইংরেজ প্রভাবিত কলকাতা মহানগরীতে বঙ্গবাসীর আকাঙ্ক্ষিত বাংলাগদ্য রচিত হয়েছিল। 'কেরী সাহেবের মুন্সী' উপন্যাস উইলিয়াম কেরী ও রামরাম বসুর কাহিনী মুখ্য স্থান অধিকার করে থাকলেও

সমকালীন বাঙালী সমাজ ও ইংরেজ সমাজজীবনের বাস্তবচিত্র ঔপন্যাসিক ফুটিয়ে তুলেছেন অনবদ্যভাবে।

বিষয়বস্তু প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে ঔপন্যাসিক রামরাম বসুকে কেন কেরী সাহেবের মুন্সী বলেছেন তা আলোচনার অপেক্ষা রাখে —

" মদনবাটীতে বাংলা গদ্যসৃষ্টিতে কেরীর ব্যক্তিগত প্রয়াস, শ্রীরামপুরের মিশনে পাত্রীদের সঙ্গে মিলিত প্রয়াস আর ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে এসে প্রয়াস পেল রাজকীয় সমর্থন ও সাহায্য। তিন জায়গাতেই রামরাম বসু তার মুন্সী, তার প্রধান সহায়ক।" [১০]

রামরামবসু কাহিনীর কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে অবস্থান করলেও প্রমথনাথের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল সমকালীন যুগ ও সমাজ, সেই সঙ্গে কলকাতা প্রেমিক লেখকের গবেষকের চোখ দিয়ে কল্লোলিনী শহর কলকাতার জন্মের পুঙ্খানুপুঙ্খ ইতিহাস পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করা। ইতিহাস নিষ্ঠ ও সমাজসচেতক প্রমথনাথের কলকাতার প্রতি একটা মোহ ছিল— এই শহরকে বিশেষ মর্যাদার চোখে দেখেছেন কারণ — 'ভারতের প্রাচীন ও নবীন যুগের সীমান্তে অবস্থিত এই শহর।' এই শহরের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনচিত্র ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে শুধুমাত্র ইংরেজ ও বাঙালীর জীবনচিত্রই নয় পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রভাবপুষ্ট 'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠীর ইংরেজ বাঙালীর মিলোনোদ্ভূত নতুন সমাজচেতনার বর্ণাঢ্য দিকটিকেও আলোকপাত করেছেন তিনি।

ধর্মযাজক কেরীর বঙ্গদেশে আগমনের কারণ হল খ্রীষ্টধর্ম প্রচার। মানবপুত্র যিশুর মহিমা প্রচারের জন্য বঙ্গজনমানসে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য সনাতন ধর্মে বিশ্বাসী বাঙালী রামরাম খ্রীষ্টগীত রচনা করে। আবার এই গীতটিকেই ব্রহ্মশব্দ বসিয়ে রামমোহনকে শোনালে

রামমোহন রামরামের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এখানে রামরামকে মনে হয় বিদূষক চরিত্র। টমাস ও কেরী ভেবেছিল বাংলাভাষায় যদি খ্রীষ্টধর্মের মহিমা প্রচার করা যায় তাহলে এদেশে হিন্দুদের ধর্মান্তরীকরণ করা সম্ভব হবে এজন্য কেরী সাহেব বাংলা গদ্যের প্রসারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে মালদহ জেলার মদনাবাটীতে ছাপাখানা স্থাপন করেন। যন্ত্রসভ্যতার এই অত্যাশ্চর্য দান তৎকালীন বাঙালী সমাজের এক গৌরবময় দিক উন্মোচিত হল।

তৎকালীন বড়লাট লর্ড ওয়েলেসিও প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন নবাগত ইংরেজদের দেশীয় ভাষা শিক্ষা দিয়ে সুষ্ঠভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করা সম্ভব। উপন্যাসে ওয়েলেসলির অর্থানুকুল্যে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের গোড়াপত্তনের ক্ষেত্রে উইলিয়াম কেরীর অবদান ছিল সর্বজনস্বীকৃত।

ঔপন্যাসিক কেরীর আগমনসূত্রে কলকাতা শহরের পথঘাট, যানবাহন ও বিভিন্ন প্রাসাদের বর্ণনা দিয়েছেন নিখুঁতভাবে। কলকাতার যানবাহন যেমন তাঞ্জাম, পাল্কি, সেড্যানচেয়ার, ল্যান্ডো, বগি, ব্রাউনব্রেরী, ফিটন প্রভৃতির বর্ণনা দিতে লেখক ভোলেন নি। এছাড়া কলকাতার রাস্তাঘাটের অবস্থা, চাঁদপাল ঘাট, এস্‌প্লানেড, চৌরঙ্গী রোড, খিদিরপুর, গার্ডেনরীচ, আলিপুর, কালীঘাট, বেড়িয়াল গ্রাউন্ড রোড, সেন্টজন গির্জা, ওল্ড ফোর্ট, ট্যাঙ্ক স্কোয়ার, দি অ্যাভিনিউ, কলকাতার বিভিন্ন স্থানের উদ্ভবের ইতিহাস বর্ণনার পেছনে লেখকের ইতিহাসচেতনার পরিচয় পাওয়া যায়।

অষ্টাদশ ঊনবিংশ শতাব্দীর সন্ধিকালে কলকাতায় স্লেভ বা ক্রীতদাসদের জীবনের করুণ দিকটির বর্ণনায় লেখকের দৃষ্টি এড়ায় নি। সেই সময়ের ইংরেজদের শাসনের বর্বরতার

দিক লেখক তুলে ধরেছেন উপন্যাসে। পলাতক ক্রীতদাসদের শাস্তি ছিল নির্মম। ন্যাড়াকে খাঁচায় বন্দী করে কলকাতা শহর ঘুরিয়ে নীলামে বিক্রয় করতে গিয়ে কুড়ি টাকার বিনিময়ে কেরী ন্যাড়াকে কিনেছিল। মূল্যবোধের এই অসঙ্গতি উপন্যাসের বর্ণিত বিষয়।

ইংরেজ বাঙালীর প্রণয়াকর্ষণ কিংবা ইংরেজদের রোমান্টিক প্রেম লেখকের কলমে ফুটে উঠেছে। আকস্মিক বায়ুপ্রবাহে বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের ঢেউ যেমন আছড়ে পড়ে বেলাভূমিতে ঠিক তেমনি কেটি, দুবো, রোজ এলমা, জন, কবি, রেশমীর গভীর প্রেমাবেগ এবং তাদের প্রেমাবেগের অন্তঃস্থলে আছড়ে পড়েছিল। প্রেমের গ্রহণ বর্জন, প্রেমের ঈর্ষাদ্বন্দ্ব, সঙ্গ নিঃসঙ্গ তা, নৈকট্য ব্যবধান, বৈরাগ্য এই সব প্রেমবোধের সোচ্চার প্রকাশ উপন্যাসের পাতায় প্রকাশিত হলেও মহৎ প্রেমের উদার শঙ্খধ্বনি এখানে বেজে ওঠে নি। এরূপ ইংরেজী প্রেমের ঘটনার সাথে সাথে তাদের সাংস্কৃতিক দিকটিও লেখক বর্ণনা করেছেন। বিয়ারবোতল, ডিনারের ব্যবস্থা, সেমিজের ব্যবহার, সমাধিতে ফুল দেয়া, পিস্তলের ব্যবহার, পরিচিত ব্যক্তিদের টুপি তুলে সম্মান জানানো ইত্যাদি ইংরেজী সংস্কার প্রমথনাথ উপন্যাসে বর্ণনা করেছেন। রেশমীর সঙ্গে জনের প্রেমে ফ্রয়েডীর প্রভাব বর্তমান।

'কেরী সাহেবের মুন্সী' উপন্যাসের বিষয়বস্তুর অপর উল্লেখযোগ্য দিক হল সতীদাহ প্রথার নারকীয় বীভৎসতার দিক উন্মোচন। সতীদাহের কাহিনী ও অপরাপর ঘটনার বাস্তব চরিত্র রেশমী ও চন্ডীবক্সী। উপন্যাসের এই কাহিনীর নায়ক ও নায়িকা এরা। বিষয় সম্পত্তির লোভে রুগ্ন বরের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে স্বামী মারা গেলে ঢুলী, ঢাকী, খোঁল কাসরের শব্দে হতভাগিনীর আর্ত চিৎকার ছাপিয়ে ঠান্ডামাথায় বিধবা নারীদের হত্যা করা হত। শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে পুণ্য অর্জনের মিথ্যে কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে সতীদাহের সমর্থন নিঃসন্দেহে

এক কলঙ্কিত অধ্যায়। সতীদাহ প্রথার নামে নৃশংস ঘটনা নিঃসন্দেহে পৈশাচিক। জোড়ামউ গ্রামের চন্ডীবক্সী রেশমীর সম্পত্তির প্রলোভনে বৃদ্ধ হাঁপানী রোগী অম্বিকা রায়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে অকালবিধবা রেশমীকে সহমরণে যেতে হয়েছিল। জ্বলন্ত চিতা থেকে রেশমী পালিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে কেরীর বজরায় ও রামরামের গৃহে সে আশ্রিতা। সহমরণ থেকে পালিয়ে আসা রেশমীর জীবনের মনস্তাত্ত্বিক দিকটি উদ্‌ঘাটিত করেছেন লেখক। রেশমীর সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়েছে রামরামবসু, আকৃষ্ট হয়েছে জন আবার মোতি রায়ের নারীলোলুপ দৃষ্টি পড়েছে রেশমীর উপর। রেশমীর জীবনের এমন একটা পর্যায় এসেছে যখন তার সামনে ছিল দুটো পথ খোলা, হয় চিতার আগুনে পুড়ে ছাই হওয়া নতুবা মোতিরায়ের বাগানবাড়ীকে তার আশ্রয়। প্রমথনাথ বিশী উপন্যাসে সহমরণের দৃশ্যও দেখিয়েছেন। চিতা থেকে পালিয়ে রেশমীর জীবনে যে সংঘাতময় অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তার পরিসমাপ্তি টেনেছেন বহুৎসবের মধ্য দিয়ে রেশমীর মৃত্যুতে।

মৃত্যুর অব্যবহিত আগে রেশমীকে জন বিয়ে করতে চেয়েছিল। রেশমী যখন খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা নিতে চেয়েছিল রামরাম তাকে বুঝিয়েছে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করলে সে নেটিভই থাকবে অন্যদিকে তার আত্মীয় স্বজন ধর্ম দেশ সব পর হয়ে যাবে।

উপন্যাসে চন্ডীবক্সীর ধনলিপ্সা, তিনু চক্রবর্ত্তীর দৌরাত্ম্য, তাদের কলহ, রেশমীকে কেন্দ্র করে মোক্ষদাকে একঘরে করে রাখবার কপট ষড়যন্ত্র, মোতিরায়ের সঙ্গে চন্ডীবক্সীর তিক্ত অভিজ্ঞতা অপমান, লাঞ্ছনার বর্ণনা উপন্যাসের বিষয়।

অষ্টাদশ ঊনবিংশ শতাব্দীর সন্ধিলগ্নে কলকাতার বাবু সমাজের বাস্তবচিত্র অঙ্কনে লেখকের সমাজচেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। কলকাতার অবস্থাপন্ন বাবুদের মধ্যে তিনু

রায়, কাশীবাবু, মোতিরায় তাদের যোগ্য প্রতিনিধি। অর্থশালী এই বাবুদের মনোরঞ্জনের জন্য রক্ষিতা রাখা, মদ্যপান, ইয়ার বন্ধুদের নিয়ে হাসি তামাসা করা ছিল স্বভাব। মোসাহেব বেষ্টিত এই বাবুরা গিলে করা জামা, কোচানো চাদর হাতে গোটা আষ্টেক আংটি, হীরের বোতাম, সোনার চেন, রক্তাভ নেত্র, ষড়রিপুর ছাপযুক্ত এই বাবুদের নাচমহলে শোনা যায় বাঈজীর নূপুর নিক্কণ। সাহিত্যে তাদের কিছুটা দখল আছে। পুলিশ তাদের হাতের মুঠায়। নারী সম্ভোগ বাসনা তাদের প্রবল। বাবুদের সামাজিক মর্যাদা প্রবল জ্ঞাতিশত্রু মাধব রায় মোতিরায়ের আকাঙ্ক্ষিত নারী রেশমীকে না পাবার জন্য ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে। প্রতিপক্ষ দল বাবুর মর্যাদার আঘাত দেবার জন্য বাবুর সঙ সাজিয়ে সর্বত্র ঘুরে বেড়ায়। এই মর্যাদাকে অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য বাবুরা জাঁকজমক করে অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

'কেরী সাহেবের মুন্সী' উপন্যাসে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের গোড়াপত্তনের ব্যাপারে কেরী ও রামবসুর উদ্যোগ এবং অন্যান্য অধ্যাপকদের অধ্যাপনা মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামনাথ বাচস্পতির পান্ডিত্য উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজকে কেন্দ্র করে গদ্যসাহিত্যের বিকাশ পর্ব আলোচনা উপন্যাসের বিষয়।

সামগ্রিকভাবে 'কেরী সাহেবের মুন্সী' উপন্যাসের আকর্ষণ শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখে। বিষয়বস্তু নির্বাচনে লেখকের সাফল্য অতিসংবাদিত। বিষয়বস্তুতে যুদ্ধোদ্যম, মৃত্যুচেতনা, অলৌকিক শক্তির বিশ্বাস, ছড়াগান, মদনমোহন তলার মদমমোহন মন্দিরে সন্ধ্যা আরতি, বারাঙ্গনা জীবন প্রভৃতি বিভিন্ন প্রসঙ্গ উপন্যাসে অভিনবত্ব দান করেছে।

# 'লালকেল্লা' – (১৯৬৩)

কথাসাহিত্যিক প্রমথনাথ বিশীর সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস 'লালকেল্লা'য় ইতিহাস সত্যের সঙ্গে সাহিত্যসত্যের অপূর্ব মেলবন্ধন ঘটিয়ে সর্বশেষ মোঘল বাদশা বাহাদুর শাহের অসহায়তাকে অনুপম বর্ণনায় ফুটিয়ে তুলেছেন। আপাতদৃষ্টিতে এই উপন্যাসের নায়ক জীবনলাল হলেও যথার্থ নায়ক শাহজাহানাবাদ ও লালকেল্লা। লালকেল্লা এই উপন্যাসে প্রতীকি হয়ে উঠেছে। মুঘল সাম্রাজ্যের উত্থান পতনের একমাত্র নীরব সাক্ষী লালকেল্লা। তার অন্দরমহলে আলোড়িত হচ্ছে ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাসের অসংখ্য ঘটনাপ্রবাহ — এই সেই লালকেল্লা যেখানে তিন তিনটি মোঘল বাদশাকে খুন করা হয়েছে, এই সেই ভারতেশ্বর নির্মিত প্রাসাদ যেখানে সম্ভবত সর্বশেষ বাদশা ও বেগম জিনৎমহলের রক্তস্রোত প্রবাহিত হয়েছে নীল যমুনার জলে, লালকেল্লা তাই একটা দগদগে ক্ষতরূপে চিহ্নিত হয়ে আছে ইতিহাসের পাতায়।

লালকেল্লার ঘটনা সিপাহী বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে রূপায়িত হয়েছে। দোর্দন্ড প্রতাপশালী ইংরেজ শক্তির সঙ্গে অতীত ঐতিহ্যলালিত মুঘলশক্তির অভ্যুত্থানের ব্যর্থ চেষ্টা উপন্যাসের মূল প্রতিপাদ্য। একদিকে সিপাহী ফৌজ ও বাদশাহী ফৌজদের সঙ্গে কোম্পানীর ফৌজদের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ইতিহাস। তখন দিল্লীর মসনদে মোঘল সাম্রাজ্যের সর্বশেষ উত্তরসূরী — দীন দুনিয়ার মালিক হিন্দুস্থানের বাদশা আবুল মজফ্ফর সিরাজউদ্দিন বাহাদুর শাহ গাজী। শাহজাহানাবাদের বাদশার বিপর্যয়ের সময়কালের অতীত ইতিহাস প্রমথনাথের কলমে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে ইতিহাস প্রসিদ্ধ রাজা জমিদার নায়কের আসন অলঙ্কৃত করেছে সেখানে প্রমথনাথের লালকেল্লা উপন্যাসে নায়ক চরিত্রের শক্তির উৎস হয়ে উঠেছে সাধারণ মানুষ। কোম্পানীর রেসেলদার জীবনলাল আলোচ্য উপন্যাসের নায়ক। তুলসী, রুমালী, পান্না, স্বরূপরাম, খুরশিদজান, সরাব মিঞা প্রত্যেকটি চরিত্রই সাধারণ তবুও তাদের জীবনের ট্র্যাজেডি মহিমান্বিত করে তুলেছে। ঐতিহাসিক ব্যক্তি হলেন বাহাদুর শা, জিনৎমহল, জেনারেল আর্চডেল, উইলসন, জেনারেল নিকলসন। ইতিহাস কাঠামোর উপর রঙ চড়িয়ে ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি প্রানবন্ত হয়ে উঠেছে।

আলোচ্য উপন্যাসে লেখক মহাকাব্যিক বিশাল পটভূমিতে অসংখ্য চরিত্রের ঘনঘটা, অসংখ্য কাহিনীর যোগসূত্র স্থাপিত করেছেন। উপন্যাসের ঘটনাধারা শুধুমাত্র শাহজাহানাবাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নি বিস্তৃত হয়েছে লক্ষ্মৌ শহর পর্যন্ত। এই বিশাল প্রেক্ষাপটে জীবন সম্বন্ধে বৃহৎ ভাবনা ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠেছে।

লালকেল্লার আসল আকর্ষণ ঘটনার চমৎকারিত্ব ও প্লটের কলাকৌশল যার কেন্দ্রে জীবনলাল স্বয়ং। প্রমথনাথ লালকেল্লা উপন্যাসে ঘটনাবহুল কাহিনীর ফাঁকে ফাঁকে ব্যক্তি চরিত্রের মর্মরহস্য উদ্‌ঘাটন করেছেন - এদিক থেকে তিনি কিছুটা বঙ্কিমানুসারী। ইতিহাস তথ্যের আলোকে যেভাবে উপন্যাসের প্রাণসঞ্চার ঘটেছে তা হল তৎকালীন সমাজ জীবন ও প্রেম কাহিনীর সুনিপুণ প্রয়োগ। প্রেমকাহিনীর বর্ণনায় প্রমথনাথ দক্ষ শিল্পী। প্রেম মনস্তত্ত্বের সুনিপুণ ব্যাখ্যাকার। তার অনবদ্য দৃষ্টান্ত রুমালী, পান্না ও তুলসী চরিত্র। প্রত্যেকটি চরিত্রই পাঠকমনে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

লেখকের কলমে শাহজাহানাবাদের বাদশা বাহাদুর শাহ, তার উজীর মীর আদল, মীর

বক্সী, শাহজাদা, বাঁদী, বেগম প্রভৃতি চরিত্রে বাদশাহী মেজাজ যেমন বর্ণিত হয়েছে অপরদিকে সুখানন্দ পরিবার, তুলসী, নয়নচাঁদ, ভূতিবুড়ি প্রভৃতি চরিত্র প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। জীবনলালের কোম্পানীতে চাকুরী জীবনসূত্রে কোম্পানীর উচ্চপদস্থ কর্মচারী কর্ণেল, মেজর, ব্রিগেডিয়ার, জেনারেল প্রভৃতি চরিত্রের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। সরাব মিঞা ও স্বরূপরামকে বাদশা ও ইংরেজ দুই ভিন্ন পক্ষ অবলম্বনকারী ফৌজ হিসেবে আমরা পাই। রূপসী পান্নাবাঈ, রুমালীবাঈ, খুরশিদজান প্রভৃতির মতো বাঈজী চরিত্র উপন্যাসের ঘটনাধারার সঙ্গে কার্যকারণ সূত্রে যুক্ত হয়ে উঠেছে। জীবনলাল হয়ে উঠেছে পান্না, তুলসী ও রুমালী প্রভৃতি রোমান্টিক নারী চরিত্রের প্রধান কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব। এজন্য উপন্যাসে ঘটনাধারায় বীভৎসরস যেমন সৃষ্টি হয়েছে তেমনি রোমান্স রস ফুটে উঠেছে অনবদ্যভাবে।

শাহজানাবাদের বাঈজী মহল্লার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের ক্ষেত্রে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী বাস্তবোচিত। বলাবাহুল্য এই বাঈজীদের কুঠি ছিল ষড়যন্ত্রের প্রধান কেন্দ্র। রূপোপজীবিনী পান্না, খুরশিদজান, রুমালী প্রভৃতি চরিত্রের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল স্বতন্ত্র। কোন কোন চরিত্রে এই জীবিকা তাদের মনে পাপবোধ জাগ্রত করে নি আবার কোন চরিত্রে ঘটেছে পাপবোধের বহিঃপ্রকাশ। তৎকালীন রামজানি সম্প্রদায়ে মেয়েদের জন্ম হওয়া ছিল অভিশাপস্বরূপ। পান্নার জবানীতে রামজানি সম্প্রদায়ের উদ্ভবের কিংবদন্তী বর্ণনায় লেখক কৃতিত্বের দাবী রাখেছেন।

সেকালে কোন দেশীয় ব্যক্তির কোম্পানীর গুণগ্রাহী হওয়া কিংবা কোম্পানীর ফৌজে যোগদান গৌরবের ছিল না। কোম্পানীর রেসেলদার জীবনলাল ও কোম্পানীর একাউনটেন্ট স্বরূপরাম বাদশাহী ফৌজদের চোখে নিন্দনীয় ছিল। নয়নচাঁদ, সরাবমিঞা ছিল বাদশার

গুণগ্রাহী মোঘল সৈন্যের প্রতিনিধি।

সে যুগের হিন্দুত্বের ধর্মকর্ম, লোকাচার, উৎসব অনুষ্ঠান, ক্রিয়াকান্ড, বিশ্বাস অবিশ্বাস, নীচতা ক্ষুদ্রতা আলোচ্য উপন্যাসে দেখানো হয়েছে। সুখানন্দের গৃহে সত্যনারায়ণ পূজার উল্লেখ রয়েছে।

তৎকালীন সময়ে গজলগান ছিল বিশেষভাবে সমাদৃত। উর্দু, ফার্সী ও বাংলা গজলগুলো মানবিক আবেদনের সাক্ষ্য বহন করে। গজল রচয়িতা মির্জা গালিবকে আমরা দেখতে পাই বাদশা বাহাদুর শাহের একান্ত অন্তরঙ্গরূপে। এছাড়া মীরার ভজনগুলো বিশেষভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। রুমালী, তুলসী, পান্নার কণ্ঠে মীরার ভজনগুলো ভক্তিভাবের চরম অভিব্যক্তি।

লেখক উপন্যাসের একদিকে স্বরূপরামের প্রেমের ব্যর্থতা যেমন চিত্রিত হয়েছে তেমনি রুমালীও তুলসীর সঙ্গে জীবনলালের আকর্ষণ বিকর্ষণ রমণীয়তা দান করেছে। রুমালী ও তুলসী দুজনেই প্রতিদ্বন্দ্বী চরিত্ররূপে তাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব, ঘাত প্রতিঘাত, প্রেমের ধারণার এক উজ্জল দৃষ্টান্ত। রুমালী রূপ ও দেহ দিয়ে প্রণয়াস্পদকে ধরতে চেয়েছে। ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানের আলোকে জীবন সম্পর্কে রুমালীর ব্যাখ্যা এক নতুন জীবনবোধের প্রকাশ ঘটেছে। খুনী সুখানন্দের জীবন পরিণতি ব্যাখ্যায় লেখকের শিল্প নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

রূপসী নারীদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা না থাকায় নারীদের অপহরণের সম্ভাবনা ছিল সে যুগে প্রবল। তুলসী কয়েকবার অপহৃতা হয়েছে সিপাহী ফৌজ ও বাদশাহী ফৌজ কর্তৃক তবুও নারী মহিমায় সমুজ্জ্বল হয়ে আছে তুলসী চরিত্র। তৎকালীন জনজীবনের মধ্যে দেখা যেত একটা আতঙ্ককর অবস্থা। একাধারে সিপাহীরা চালাত লুঠতরাজ, শ্বেতাঙ্গ, ফিরিঙ্গী

রমণীদের ধরে নিয়ে শাহজাহানাবাদে নির্মমভাবে হত্যা করা ছিল দৈনন্দিন ঘটনা। রূপসী ভারতীয় নারীরাও অনেক ক্ষেত্রে রেহাই পেত না। এই মৃত দেহগুলো বস্তাবন্দী করে তাঞ্জামে চাপিয়ে ফেলে দেওয়া হত যমুনাগর্ভে।

উক্ত সময়কালে অনেকেরই প্রত্যাশা ছিল পলাশীর যুদ্ধের শতবার্ষিকী তারিখে কোম্পানীর ঘটবে পরাজয়। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল পরাজয় ঘটেছে বাদশাহী শাসনের। অভ্যুত্থান ঘটেছে ইংরেজ কোম্পানী শক্তির।

উপন্যাসে সেক্সপীয়ারের সাহিত্য প্রভাবিত মনুষ্যতর চরিত্র ক্যালিবানকে দেখা যায়। সে ছিল জীবনলালের একান্ত প্রিয়। জীবনলালের মৃত্যুর পর ক্যালিবানের আর্ত চীৎকার মনুষ্যতর প্রাণীর মহিমাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

ঔপন্যাসিক লালকেল্লা উপন্যাসে ইংরেজ জেনারেল নিকলসন, জেনারেল আরর্সেডেল উইলসন, হডসন, ব্রিজম্যান প্রভৃতি ইংরেজ চরিত্র উপন্যাসের ঘটনাধারার এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। প্রমথনাথের কলমে ইংরেজ চরিত্রগুলো এদেশীয় চরিত্রের চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে তাদের বীরত্ব ও সক্রিয়তার গুণে। ইংরেজ কোম্পানীর সামরিক ও বেসামরিক বিভাগের কর্মীরা তাদের উদ্ভাবনীচিন্তা সংগঠন কুশলতা ও তৎপরতা এবং চারিত্রিক দৃঢ়তা ঔপন্যাসিক নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন। তারা খ্রীষ্টধর্মবিরোধী কোন কার্যকলাপের সম্পূর্ণ বিরোধী। ইংরেজ রমণী এমিলার রক্তরঞ্জিত রুমালটি দেখে ইংরেজ উচ্চপদস্থ কর্মচারীর প্রতিশোধস্পৃহা জাগ্রত হয়েছিল। সে চেয়েছিল কোন ভারতীয় রমণীকে রাস্তার উপর বেইজ্জত করতে। অথচ এটা হল খ্রীষ্টধর্ম বিরোধী কাজ তাই এই জঘন্য কাজ থেকে তারা বিরত থেকেছে।

যুদ্ধবর্ণনার দিক থেকে কামান, বন্দুক, পিস্তল ও বারুদের প্রচলন ছিল, অশ্বারোহী ও

পদাতিক সৈন্যবাহিনী ছিল উভয়পক্ষে। লেখক আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্রের উল্লেখ করেছেন উপন্যাসে। সমরাঙ্গণে ইংরেজ ফৌজের মানসিকতার বৈপরীত্য লেখক দেখিয়েছেন। জীবনলালের জবানীতে এই মানসিকতা বর্ণিত হয়েছে। ভারতীয় সিপাহীরা কামানের জ্বলন্ত গোলাগুলো সংগ্রহ করবার কথা ভাবতেই পারে নি অপরদিকে ইংরেজ সৈন্যরা জ্বলন্ত গোলাগুলোকে বস্তায় চাপা দিয়ে সংগ্রহ করত সামরিক খরচ বাঁচাবার জন্য। এছাড়া যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় ইংরেজ খানসামারা খাদ্য নিয়ে কোম্পানীর ফৌজদের হাতে হাতে পৌঁছে দিত। অপরদিকে বাদশাহী সৈনিকরা খাবারের গন্ধ পেলে যুদ্ধ ছেড়ে খাদ্যগ্রহণের জন্য ব্যস্ত হত। এছাড়া ইংরেজরা কোন ভারতীয় উৎসাহী সৈন্যকে কোম্পানীর সেনাবিভাগে নিয়োগ করত বহুভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষার পর। কোন সৈনিক শত্রুপক্ষের কারও প্রতি সহানুভূতি জানালে তাকে গুলিবিদ্ধ করে মেরে ফেলে হত। যুদ্ধ শেষ শাহজাহানাবাদের দ্বারে দ্বারে উড্ডীয়মান ইংরেজ পতাকা। কেউ যদি সেই পতাকা তুলে ফেলবার চেষ্টা করত তখন তাদের মৃত্যুদন্ড হত অনিবার্য। রুমালী ইংরেজ পতাকা তুলতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায় আবার শাহজাদাদের তাঞ্জামে উঠবার অভিযোগে হড্‌সনের গুলিতে জীবনলালের ঘটে মৃত্যু ।

ঔপন্যাসিক তৎকালীন অর্থনৈতিক চিত্র বিশেষ করে আকবরী মোহরের একাধিকবার উল্লেখ করেছেন। লেখক মুঘল যুগের অতীত ঘটনাকে উপস্থাপিত করেছেন। সম্রাট শাহজাহানের নির্মিত লালকেল্লার বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের বিবরণ দিয়েছেন। ঝড়খা দর্শনের বর্ণনা দিতেও লেখক ভোলেন নি। বিচারপ্রার্থীরা ঘন্টা বাজিয়ে বিচার প্রার্থনা জানাত, যার শেকল যমুনার ঘাট পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

প্রমথনাথ শাহজাহানাবাদের লালকেল্লা বর্ণনায় যেমন মুখর সেই সঙ্গে দেওয়ানী খাস, মতি মসজিদ, হুমায়ুন শার কবর, লাহোর দরজা, দিল্লী দরবাজা, কাশ্মীরী দরজা, দিল্লী দরবার, রঙমহল, বাদশাহী বৈঠকখানা, দিলমঞ্জিলখানার বিস্তৃত ঐতিহাসিক তথ্য বর্ণনা করেছেন। লেখক আরও বর্ণনা করেছেন তৎকালীন বাদশার ভ্রমণকালীন পরিবেশ ঃ

" বাদশা যখন হাতীর পিঠে চেপে চাঁদনী চক বরাবর, সম্মুখে চলে শাহী পল্টন তুরী, ভেরী, দামামা বাজে, নকীব ঘোষণা করে, শেঠলোক, বেনিয়ালোক, দোকানদার সব, দোকান পাঠ খোল, দিন দুনিয়ার মালিক হিন্দুস্থানের বাদশার হুকুম।"[১১]

উ পন্যাসে মৃত্যুচেতনা গভীর তাৎপর্য বহন করে স্বরূপরামের মৃত্যু নয়নচাঁদের গুলিতে, হডসনের গুলিতে জীবনলালের মৃত্যু, জীবনলালের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজ পতাকা খুলতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রাণ হারায় রুমালী। এই দুটি মৃত্যু পাশাপাশি বর্ণিত হয়েছে।

লেখক বর্ণনা করেছেন যখন বাহাদুরশাহ ও জিনৎমহলকে বন্দী করে আনা হয়েছিল লালকেল্লায় তখন ভারতীয় শত সহস্র দর্শক মূঢ়ের মতো অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল একজন ভারতীয়ও জানায়নি তার প্রতিবাদ।

কথাসাহিত্যিক দিল্লী নামটির উদ্ভবের ইতিহাস ব্যক্ত করেছেন। অতীত ইতিহাসের রাজবংশের পরে রাজবংশ অর্গলিত করে রেখেছে দেউড়ি। দেউড়ি, দেহলী, দেহলি থেকে এসেছে দিল্লী নামটি তার উল্লেখ করেছেন। সেই সঙ্গে চমকপ্রদ কিছু বর্ণনা বিশেষ করে কিংবদন্তী, লোকশ্রুতি, অতীত ইতিহাসের বস্তুনিষ্ঠতা, জনশ্রুতি প্রভৃতি উপস্থাপিত বিষয় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। লালকেল্লার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন প্রমথনাথ এখানে

তার ইতিহাস চেতনার পরিচয় ফুটে উঠেছে।

প্রমথনাথ বিশী লালকেল্লা উপন্যাসের বিষয়বস্তু নির্বাচনে একটা বৃহত্তর যুগের মানুষের জীবনচিত্র এবং তাদের বৈশিষ্ট্য আপন আপন মহিমায় সমুজ্জ্বল করে তুলে ও প্রেমের বিশিষ্ট রূপের বর্ণনায় এবং সিপাহী বিদ্রোহোত্তর কোম্পানীর মানসিকতা ও বাহাদুর শাহের অসহায়তা ফুটিয়ে তুলে উপন্যাসের কথাবস্তুকে রমণীয় করে তুলেছেন।

## 'বঙ্গভঙ্গ' – (১৯৭৫)

প্রমথনাথ বিশীর ঐতিহাসিক উপন্যাস বঙ্গভঙ্গের পটভূমি ভারতের - স্বদেশী আন্দোলন। বঙ্গদেশকে কেন্দ্র করে এই আন্দোলন সর্বভারতীয় আন্দোলনে রূপলাভকরে। লর্ড কার্জন ভেবেছিলেন বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে ভারতীয় জাতীয়বাদের ভিত দুর্বল হয়ে যাবে এবং সাম্রাজ্যবাদ অটুট থাকবে। কিন্তু তার আশা পূরণ হয়ে ওঠেনি। বঙ্গ ভঙ্গের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বাঙালী তথা ভারতবাসী চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে ছাড়ে নি। দিনাজপুর ও রাজসাহী শহরের হিন্দু, মুসলমান ছাত্র, শিক্ষক ও মধ্যবিত্ত সকলেই এই আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিন। বঙ্গভঙ্গের প্রতিক্রিয়ায় স্বদেশী পণ্যদ্রব্য বর্জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে বিদেশী প্রশাসন বর্জন, বিদেশী আইন ও বিদেশী শিক্ষা বর্জনের লক্ষ্যে ছাত্রসমাজের ভূমিকা ছিল সর্বাগ্রগণ্য। বয়কটকে কেন্দ্র করে স্বদেশ আত্মার আবিষ্কার স্বীকৃতি হয় সেই সঙ্গে বোমা পিস্তলবাহী অগ্নিযুগের আবির্ভাব ঘটে। গান্ধীবাদী আন্দোলনের প্রসার লাভ ঘটে। এই পটভূমিকায় 'বঙ্গভঙ্গ' উপন্যাসটি রচিত হয়েছে।

দিনাজপুর ও রাজসাহী শহরের কয়েকটি পরিবার এবং রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসের প্রধান চরিত্র। উপন্যাসের ভৌগলিক পটভূমি কলকাতা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের তোষণকারী রায়বাহাদুর উপধিধারীরা ছিল প্রতিষ্ঠানের ধারক ও বাহক। ইংরেজদের তল্পীবাহকরূপে এই শ্রেণী প্রতিনিধিরা ব্যক্তি ও সম্পদের নিরাপত্তা, সমৃদ্ধি, স্বজনপোষণ, স্বার্থপরতা, পদলোভী, ব্যক্তিত্বহীন শ্রেণীভূক্ত। শাসক শ্রেণীর অনুকূল ভাবাদর্শ চার দেওয়ালে বদ্ধ না রেখে ইংলেন্ডশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পরলোকগমন উপলক্ষ্যে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করে ঔপনিবেশিক শাসনকেই জানিয়েছিলেন আনুগত্য। প্রমথনাথ বিশীর 'বঙ্গভঙ্গ' উপন্যাসে বুদ্ধিজীবি শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করেছে যজ্ঞেশ রায়, লাহিড়ী, হরিপদ, অক্ষয় চৌধুরী, বীরেন চৌধুরী , দুখু মৈত্র, তারাপদ প্রভৃতি চরিত্র।

বিংশ শতাব্দীর রাজনৈতিক অস্থিরতাকে অবলম্বন করে প্রমথনাথ বিশী 'বঙ্গভঙ্গ' উপন্যাস লেখায় উৎসাহিত হয়েছেন। উপন্যাসে শচীন ও সুশীল নামে রায়বাহাদুর যজ্ঞেশ রায়ের পুত্রদ্বয় স্বদেশী মন্ত্রে দীক্ষিত। শচীন উপেক্ষা করেছিল শ্রাদ্ধানুষ্ঠান উপলক্ষে পিতার অহেতুক বাড়াবাড়ি, সে নিজ প্রচেষ্টায় উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য কলকাতায় আসে। দিনাজশাহী শহরের লোকেশ্বর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক অবিনাশবাবু সরকারী স্কুলের চাকরি ছেড়ে দিয়ে বেসরকারী স্কুলে চাকরি নিয়েছিল। অবিনাশবাবু ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, স্বদেশপ্রেম ছিল তার সাচ্চা, তিনি মানসিকতায় ঔপনিবেশিক শাসন বিরোধী ও বঙ্গভঙ্গ বিরোধী। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' ও বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের দেশাত্মবোধক বক্তৃতা তরুণ সমাজকে অনুপ্রাণিত করেছিল। ইংরেজ প্রবর্তিত কেরাণী তৈরীর শিক্ষার পরিবর্তে জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অবিনাশবাবু স্বদেশী স্কুল স্থাপন করেছিল, আশুতোষ মুখার্জী ছিলেন পৃষ্ঠপোষক।

তৎকালীন ম্যাজিষ্ট্রেট ডোভার সাহেব আপোষনীতির বিশ্বাসী হলেও মিঃ ক্লোজেট ছিলেন অত্যাচারী শাসক। লর্ড কার্জনের প্রস্তাবকে বাস্তবায়িত করবার লক্ষ্যে মিঃ ক্লোজেট সাহেব ছিলেন বদ্ধপরিকর। নতুন সরকারী কার্লাইল সার্কুলার ফুলার সাহেব কর্তৃক জারি হবার পর ছাত্র আন্দোলনকে নিষ্ক্রিয় করবার জন্য ছাত্রদের শোভাযাত্রা, সভা প্রভৃতি নিষিদ্ধ করে দেয়। বঙ্গভঙ্গের প্রতিক্রিয়ায় রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগে রাখী বন্ধন উৎসবে অংশগ্রহণ করে হিন্দু মুসলমান সমবেতভাবে।

কলকাতা শহরে রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও সুরেন বাড়ুজ্জে, বিপিন পাল, রাসবিহারী ঘোষ, টহলরাম গঙ্গারামের জ্বালাময়ী বক্তৃতায় স্বদেশী আন্দোলনের দাবাগ্নি বঙ্গদেশের সর্বত্র বিস্তার লাভ করে। শিক্ষক অবিনাশবাবু, দিনাজশাহী শহরে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দান করে। ছাত্র অতুল, ভূপতি, নৃপেন বয়কট আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। বিলিতি কাপড়, বিলিতি চিনি, বিলিতি লবণ বিক্রয় বন্ধ করে স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের জন্য উত্তাল ছাত্রসমাজ পিকেটিং-এ অংশ নেয়। রিপন কলেজের অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর উদ্যোগে উক্ত কলেজের তরুণ অধ্যাপকসহ শচীন বয়কট আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। অমৃতবাজার, বেঙ্গলী দৈনিক পত্রিকা, হিতবাদী প্রভৃতি পত্র পত্রিকায় স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের জ্বালাময়ী সংবাদ দেশের সর্বত্র প্রচারিত হয়। দেশের ধোপা, নাপিত, কামার, কুমার, তাঁতি প্রত্যেকেই শপথ গ্রহণ করে বিদেশী দ্রব্য বর্জনের।

অপরদিকে সুরাট কংগ্রেসের দক্ষযক্ষ কান্ডের ফলে জন্ম নেয় চরমপন্থী ও নরমপন্থী দুটো দলের। দুটো দলই দেশ উদ্ধারের গৌরব অর্জন করতে আগ্রহী। উভয় দলেরই একমাত্র মূলমন্ত্র বন্দেমাতরম্। স্থানে স্থানে চরমপন্থীরা গড়ে তোলে গুপ্ত সমিতি যারা

বোমা পিস্তল দিয়ে হত্যার রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করার ফলে ব্রিটিশদের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল। আলিপুরের বোমার মামলা সহিংসনীতির ফলশ্রুতি। বারীন ঘোষের স্বীকারোক্তি দেশময় চাঞ্চল্যকর অবস্থার সৃষ্টি করে। ঋষি অরবিন্দকে নিবেদিতা কলকাতা থেকে ফরাসী জাহাজে গোপনে পন্ডিচেরীতে পাঠিয়ে দিতে আগ্রহী। এসময় রায়বাহাদুরের পুত্র সুশীল অগ্নিযুগের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়। ব্যায়াম, কুস্তি, লাঠিখেলা অনুশীলন করে দিনাজপুরে চরমপন্থী মতের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে ওঠে ও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে।

প্রমথনাথ উপন্যাসে চারটি নারীচরিত্রের সৃষ্টি করেছেন তারা হলেন অবিনাশবাবুর স্ত্রী নিস্তারিণী দেবী ও কন্যা রুক্মিণী এবং যজ্ঞেশ রায়ের স্ত্রী বিন্দুবাসিনী ও কন্যা মলি । উপন্যাসে সুকৌশলে লেখক রুক্মিণীর বিবাহের এক সংঘাতময় ঘটনা ফুটিয়ে তুলেছেন। রায়বাহাদুরের পুত্র শচীনের সঙ্গে অবিনাশ বাবুর কন্যা রুক্মিণীর বিয়ে বহু ঘাত প্রতিঘাতের পর অনুষ্ঠিত হয়। হরিপদ এ ব্যাপারে বহু ষড়যন্ত্রমূলক আচরণ করেছে। অর্থবিত্তহীন অবিনাশবাবুর কন্যার বিবাহের অর্থ যুগিয়েছিল ছাত্ররা এবং নবীন মহাজনের সহযোগিতায় শচীনের সঙ্গে রুক্মিণীর বিয়ে হয়। লেখক তৎকালীন সমাজজীবনে হরিপদর মত চরিত্র বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে আহরণ করেছেন। একজন স্বদেশী নেতাদের পারিবারিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা সে সময়কার কোন অস্বাভাবিক ঘটনা নয়।

রুক্মিণীর বিবাহকে কেন্দ্র করে যে জলঘোলা হয়েছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে যজ্ঞেশ রায় রায়বাহাদুর খেতাব পরিত্যাগ করে ব্রিটিশ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। শান্তিভঙ্গের অভিযোগে যজ্ঞেশ রায়কে গ্রেপ্তারবরণ করতে হয়েছে। কারামুক্ত হয়ে যজ্ঞেশ রায় নরমপন্থী মতবাদের বিশ্বাসী হয়ে দিনাজশাহী শহরে স্বদেশী আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয়।

বিভিন্ন বুদ্ধিজীবিদের মধ্যস্থতায় প্রমথনাথ হাস্যরস পরিবেশন করেছেন। শ্বেতাঙ্গ সাহেবদের ও বুদ্ধিজীবিদের স্বরূপ আমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন। উপন্যাসে শ্বেতাঙ্গ সাহেবরা ভারতবাসীকে নেটিভ বলে চিহ্নিত করেছেন।

ইংরেজ শাসক শাসনযন্ত্রকে শক্তিশালী করবার জন্য হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে মুসলমানদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে তারই বাস্তব রাজনৈতিক প্রতিফলন ঘটে মুসলিম লীগ গঠনের মধ্য দিয়ে। স্বদেশীযুগে প্রমথনাথ বিশী সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প দেখেছেন। মুসলমান প্রধান পূর্ববঙ্গের মুসলমানরা হিন্দুগ্রাম লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগ ঘটায়। বরিশাল, ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, রংপুর, পাবনা, দিনাজশাহী ও কলকাতা শহরে রাজনৈতিক আন্দোলন বৃহত্তর আকার ধারণ করে। সরকারী অত্যাচারে চরমে ওঠে এবং দমনমূলক নীতি প্রয়োগ করে।

গুপ্ত সমিতির ইংরেজদের ভিতকে কাঁপিয়ে দেবার জন্য হত্যার রাজনীতি বেছে নেয়। রক্ত দেয়া নেয়ার নীতি দিনাজশাহী শহরে ও গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। গীতা, আনন্দমঠ পাঠ করে মানসিক শক্তি অর্জন করে, গুপ্ত সভায় দেশের বর্তমান অবস্থা, ইংরেজ সাম্রাজ্যের পতনের ইঙ্গিত দিয়ে স্বদেশ প্রেমের চূড়ান্ত স্বাক্ষর রেখে যায় চরমপন্থী দলের বিশ্বাসী গুপ্ত সমিতিগুলি। মন্ত্রগুপ্তি উচ্চারণ করে এই আন্দোলনের সদস্য তৈরী হয়। অনেক সময় মন্ত্রগুপ্তি লঙ্ঘনের দায়ে মৃত্যু হয়ে ওঠে অনিবার্য। দিনাজশাহীর কুস্তির আখরা থেকে বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সুশীল গুপ্তসমিতির ক্যাপ্টেন হিসাবে নির্বাচিত হয়। ধন, সম্পদ, স্ত্রী, পুত্র ত্যাগ করে দেশ উদ্ধারের জন্য গুপ্তসমিতির সভ্যরা সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়। কলকাতার বুকে চরমপন্থীদের সন্ত্রাসের ফলে সাহেব, ইংরেজ কর্মচারীদের গুলিতে প্রাণ হারাতে হয়। এই

সময় কলকাতা থেকে রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয়। সরকারী নির্দেশে বঙ্গভঙ্গ রদের ফলে স্বদেশীরা বয়কটনীতি প্রত্যাহার করে নেয়। বঙ্গভঙ্গ রদ এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা এর ফলে দিনাজশাহী ও অন্যান্য শহরে আনন্দোচ্ছ্বাস ছড়িয়ে পড়ে, মাঠে ময়দানে সভা সমিতিতে বক্তৃতা ও দেশাত্মবোধক সঙ্গীতে মুখর হয়ে ওঠে — 'বন্দেমাতরম্' 'সার্থক জনম আমার' ইত্যাদি সঙ্গীতে স্বদেশ প্রেমের বহিঃ প্রকাশ ঘটে।

ঔপন্যাসিক রাজনৈতিক ঘটনার ফাঁকে ফাঁকে পারিবারিক জীবনের খুঁটিনাটি বর্ণনা দিয়েছেন। শচীনের সঙ্গে রুক্মিণীর কথোপকথন, রমণীর সঙ্গে মলিনার বিয়ের ব্যাপারে আলোচনা, মলিকে নিয়ে রমণী, শচীন, রুক্মিণীর দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে সাধকবেশী সুশীলের দর্শন, গঙ্গার তীরের বর্ণনা কবিত্বময় হয়ে উঠেছেঃ

" জোয়ারের কলকল, স্নিগ্ধ বাতাস এপারে সন্ধ্যার তরল অন্ধকার, ওপারে সূর্যাস্তের শেষ আভা, নদীর জলে নৌকার আলো, মন্দিরে শঙ্খ ঘন্টার রব, সমস্ত মিলে মায়াজাল নিক্ষেপ করলো তাদের মনের উপর।" [১২]

প্রমথনাথ রমণী ও মলিনার প্রেমের বর্ণনা দিয়েছেন। রমনীর গুপ্তসমিতির সভ্য হয়ে শপথ বাক্য লঙ্ঘন করার অভিযোগে সুশীলের অব্যর্থ গুলিতে মৃত্যু ঘটে। ইতিমধ্যে কলকাতায় পুলিশের হেড কনষ্টেবল হরিপদ দেবের মৃত্যু ঘটে গুলিবিদ্ধ হয়ে। এই হত্যার অভিযোগে সুশীল গ্রেপ্তার হয়। চার নম্বর সেলে সুশীলকে রাখা হয়েছে। এই সময় মিঃ মজুমদার ইলিশিয়াম রো স্পেশাল ব্রাঞ্চের সর্বশক্তিমান সুপারিন্টেনডেন্ট, মিস্ ফ্লোরা এবং মিস্ রোজি ছিল জেলখানার দায়িত্বে। সুশীল সম্পর্কে তাদের মন্তব্য সুদর্শন বলিষ্ঠ যুবক, অদম্য সাহস,

অসীম সহিষ্ণুতা সুশীলের। এরা দেশের কাজ না করে নরহত্যা করেছে স্কুল কলেজের মাষ্টাররা তাদের কি শিক্ষাই না দিচ্ছে। মিস রোজির প্রচেষ্টায় সুশীলের পিতৃপরিচয় অধ্যয়নরত কলেজের নাম জেনে নেয়। সে রাতেই সুশীলকে ফাঁসবদ্ধ অবস্থায় ঝুলতে দেখা যায়। তার দেওয়ালের পাশে লেখা — "চরিত্রহানি, শপথভঙ্গ, মৃত্যু।" এই সংবাদ এসে পৌঁছায় সুরেন বাড়ুজ্জের কাছে। ইলিশিয়াম রো এর পুলিশ জানায় অ্যাপিপ্লেক্সি রোগে তার মৃত্যু হয়েছে। শচীন, অবিনাশ, যজ্ঞেশ, মলিনা সুশীলের মৃত্যু সংবাদ জানতে পারে। সুশীলের অন্ত্যেষ্টি উপলক্ষে পাড়ে ব্রাহ্মণরা পুলিশের নির্দেশে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করে। এই নিদারুণ আঘাতে অন্তঃসত্ত্বা রুক্মিণীর নির্দিষ্ট সময়ের আগেই যমজ সন্তান ভূমিষ্ট হয় ও যজ্ঞেশবাবু তাদের নাম রাখে লব ও কুশ।

প্রমথনাথ বিশীর বঙ্গভঙ্গ উপন্যাসটির বিষয়বস্তু বঙ্গভঙ্গ থেকে স্বদেশী আন্দোলন পর্যন্ত বঙ্গদেশের রাজনৈতিক অবস্থার বাস্তব চিত্রের বর্ণনা। ঔপন্যাসিক আলোচ্য উপন্যাসে যে ইতিহাসচেতনার পরিচয় দিয়েছেন এবং ঐতিহাসিক জীবনরস পরিবেশন করেছে তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখে।

## "পনেরোই আগষ্ট" – (১৯৭৭)

রক্তাক্ত স্বাধীনতা প্রাপ্তি বিষয়ের উপর লেখা বাংলায় একমাত্র নির্ভরযোগ্য উপন্যাস প্রমথনাথ বিশীর পনেরোই আগষ্ট ( ১৯৭৭)। ভারতের রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা ও দেশবিভাগকে কেন্দ্র করে স্বয়ংসম্পূর্ণ উপন্যাসের স্রষ্টা হিসাবে আলোচ্য উপন্যাসটিতে বিংশ শতাব্দীর

সুদীর্ঘ ৩০ বছরের ঘটনাপ্রবাহ স্থান লাভ করেছে। লেখকের কলমে ঐতিহাসিক রসের সঙ্গে মিশেছে চাঞ্চল্যকর ঘটনা ও কল্পিত চরিত্রের জীবনরস। ভীষ্ম সাহানীর 'তমস' উপন্যাসের সমকক্ষতা দাবী করতে না পারলেও বাংলা সাহিত্যে 'পনেরোই আগষ্ট' উপন্যাসটির সাহিত্যিক মূল্য অসাধারণ ।

বিষয়বস্তু নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রমথনাথের স্বাতন্ত্র্যতা উল্লেখের দাবী রাখে। কোন পন্থা অবলম্বন করে ভারতের স্বাধীনতা এল ইতিপূর্বে এ বিষয়ে কোন কথাশিল্পী কলম ধরেন নি জাতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে প্রমথনাথের এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসাতীত।

অবিভক্ত বঙ্গদেশের উত্তরবঙ্গের দিনাজপুর ও রাজসাহী শহরের কয়েকটি নগণ্য মধ্যবিত্ত পরিবারের নরনারীদের সক্রিয়ভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ এবং কলকাতা শহর ও সুদূর মফঃস্বলের কিছু মধ্যবিত্ত পরিবার এই উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করেছে। সুতরাং উপন্যাসের ভৌগোলিক পটভূমি দিনাজশাহী শহর ও কলকাতা শহর।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায় স্বদেশী আন্দোলন, সশস্ত্র আন্দোলন, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, আই এন এ গঠন ও ভারত অভিযানের পটভূমির উপর দাঁড়িয়ে আছে আলোচ্য উপন্যাসটি।

দিনাজশাহী ও কলকাতা শহরের স্বদেশপ্রেমিক নরনারীদের দীর্ঘ নিঃশ্বাসে মুখরিত আলোচ্য উপন্যাস। মহৎ প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তাদের মহৎ ত্যাগ, মহৎ দুঃখ, প্রাণত্যাগ ও সর্বস্বত্যাগের কাহিনী উপন্যাসের মূল বিষয়। বুকের রক্তের লোহিত সমুদ্রে আত্মাহুতি দিয়ে শহীদ হয়েছেন তাঁরা। উপন্যাসের চরিত্ররা বিভিন্ন মতের প্রতিনিধিত্ব করেছে, ঔপন্যাসিক রাজনৈতিক মত ও পথকে প্রকাশ করেছেন নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। সুরেন্দ্রনাথ, অরবিন্দ,

গান্ধীজী, সুভাষচন্দ্র, সূর্যসেন, বিপিনচন্দ্র প্রভৃতি ঐতিহাসিক চরিত্র উপন্যাসের ঘটনাধারায় স্থান লাভ করেছে। এছাড়া কাল্পনিক চরিত্র হিসাবে শচীন নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের লোক, সুশীলকে দেখা গেছে সশস্ত্র বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত থাকতে, ভূপতি সসৈন্য বিপ্লবী দলের প্রতিনিধিত্ব করেছে, রাধা যোগ দিয়েছে চট্টগ্রাম বিপ্লবী দলে, রুক্মিণীর যমজ পুত্র লব যোগ দিয়েছে চট্টগ্রাম বিপ্লবী দলে, কুশ যোগ দিয়েছে কম্যুনিষ্ট পার্টিতে, অরবিন্দের জীবনযন্ত্রণা ছিল আরও গভীর একটি মেয়েকে না পেয়ে এবং অন্য জনকে পেয়েও হারিয়ে সে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলেছে। শুভ্রা ও মলিনা দেশের জন্য সর্বস্বত্যাগ করেছে, মানবপ্রেম ও স্বদেশপ্রেমের মূর্ত প্রতীকরূপে গগনচুম্বী ব্যক্তিত্ব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে শিক্ষক অবিনাশ চক্রবর্ত্তী। এছাড়া ইংরেজদের তোষণকারী যজ্ঞেশ রায় তার মত ও পথকে পরিত্যাগ করে প্রথম সারির কংগ্রেসী নেতা হয়ে দিনাজশাহী শহরে নেতৃত্ব দান করেছে তবে স্বাধীনতার সন্ধিলগ্নে তার জীবনসংশয় মুহূর্তেআকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা ঘোষণা সম্ভবত শোনার সৌভাগ্য হয়ে ওঠে নি।

কোন পন্থা অবলম্বনে ভারতের স্বাধীনতা সূর্যের উদয় হয়েছিল তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন লেখক আলোচ্য উপন্যাসে। লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনার নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন বা স্বদেশী আন্দোলন যার নেতৃত্বে ছিলেন প্রধান রাষ্ট্রনায়ক সুরেন্দ্রনাথ আবার সশস্ত্র বিপ্লবের অন্যতম পুরোধা অরবিন্দ। সসৈন্য বিপ্লবে দেশীয় সৈন্যদলে অসন্তোষ সৃষ্টি ও বিদেশ থেকে অস্ত্র-সংগ্রহের চেষ্টা, সূর্যসেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রামে ইংরেজ অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ও চট্টগ্রাম অধিকারের চাঞ্চল্যকর ঘটনা, নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে আই এন এ গঠন ও ভারত অভিযানে পরাধীন ভারতের এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন, সত্যাগ্রহীদের আত্মত্যাগ, আগষ্ট বিপ্লবের ডাক সব মিলিয়ে

ভারতের স্বাধীনতা লাভ ও ক্ষমতা হস্তান্তর ভারত ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য ঘটনা যা প্রমথনাথের কলমে ইতিহাস রসের সৃষ্টি করেছে। ভারতের স্বাধীনতা বিষয়ে লেখা 'পনেরোই আগষ্ট' উপন্যাসে প্রমথনাথের একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি।

যুগযন্ত্রণায় তাড়িত হয়ে এখানকার পাত্রপাত্রীদের মহৎ ত্যাগে ঔপন্যাসিকের জীবনদর্শন উচ্চারিত। প্রমথনাথ এখানে ব্যক্তিজীবনের ঘটনার চেয়ে সমষ্টির মূল্যবোধের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন, প্রতিটি চরিত্র আপন স্বাতন্ত্রে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে প্রমথনাথের কলমে।

এছাড়া আলোচ্য উপন্যাসে অত্যাচারী ইংরেজদের প্রতিনিধি ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশদের নির্মমতাকে ঔপন্যাসিক বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিতে তুলে ধরেছেন।

পরিশেষে বলা যায় বিষয়বস্তু হিসাবে 'পনেরোই আগষ্ট' প্রমথনাথের এক সফল সৃষ্টি একারণেই তিনি ভাবের সঙ্গে ভাষার অপূর্ব মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন ও স্বদেশচেতনার পরিচয় দিয়েছেন।

# উল্লেখপঞ্জী

১। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বঙ্গসাহিত্যের উপন্যাসের ধারা' পৃঃ ৬৪৪

২। প্রমথনাথ বিশী, 'পদ্মা' পৃ ১০৯

৩। প্রমথনাথ বিশী, তদেব পৃ ৫১

৪। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গসাহিত্যের উপন্যাসের ধারা।

৫। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, গ্রন্থপরিচিতি, 'জোড়াদীঘির উদয়াস্ত' পৃঃ ১০

৬। প্রমথনাথ বিশী — 'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার' পৃঃ ২৪

৭। প্রমথনাথ বিশী — 'চলনবিল' পৃঃ ১৮৭

৮। প্রমথনাথ বিশী — 'অশ্বত্থের অভিশাপ' পৃঃ ৬১৩-৬১৫

৯। প্রমথনাথ বিশী — 'অশ্বত্থের অভিশাপ' পৃঃ ৯৩৯

১০। প্রমথনাথ বিশী — 'কেরী সাহেবের মুন্সী' পৃঃ৫১৪

১১। প্রমথনাথ বিশী — 'লালকেল্লা' পৃঃ ২৭৫

১২। প্রমথনাথ বিশী — 'বঙ্গভঙ্গ' পৃঃ ১৭৮